inQuest

An Associate Multidisciplinary Multilingual Research Journal
of
Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

Regd. No.: S/2L/48328 of 2015-16
Registered under West Bengal Registration of Societies Act. XXVI of 1961

Vol. VII ■ Issue: I & II ■ Summer 2023

ইনকোয়েস্ট

সপ্তম বর্ষ ■ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ■ গ্রীষ্ম ২০২৩

a KSERA initiative

www.facebook.com/inquestjournal
KSERA

Colaborating Partner
KHARAGPUR COLLEGE
under : Vidyasagar University

inQuest

An Associate Multidisciplinary Multilingual Research Journal of Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

www.facebook.com/inquestjournal

Editor

Bijay Palit

chiefeditor.inquestjournal@gmail.com

Editorial Board

Sujata Bera, Dr. Bishnu Sikder, Rituparna Adak, Nani Gopal Chanda, Chinmoy Mondal, Asit Kr. Sau, Dr. Mangal Kumar Nayek, Dr. Deepanjana Sharma, Debasish Roy

Peer Review Committee

Prof. Gopa Dutta, Former Professor, Department of Bengali, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal & Ex Vice-Chancellor, University of Gour Banga, Malda, West Bengal

Prof. Damodar Maity, Professor, Department of Civil Engineering, IIT, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Prantosh Sen, Former Principal, Gour Mahavidyalaya, Malda, West Bengal, India

Dr. Pradip K. Bhowmik, Associate Professor, Rural Development Center, IIT, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Rajarshi Das Bhowmik, Assistant Professor, department of Civil Engineering, IISC, Bangalore, India

Dr. Siddhartha Guha Ray, Associate Professor, Department of History, Vivekananda College, Kolkata, West Bengal, India

Dr. Rishi Ghosh, Assistant Professor, Department of Bengali, Gaur Mahavidyalaya, Malda, West Bengal, India

Dr. Pankaj Saha, Associate Professor, Department of Hindi, Kharagpur College, Kharagpur, West Bengal, India

Dr. Munni Gupta, Assistant Professor, Department of Hindi, Presidency University, Kolkata, West Bengal, India

Dr. Sourav Gupta, Assistant Professor, Center for Journalism and Mass Communication, Central University of Orissa, Koraput, Orissa, India

Dr. Makhanlal Nanda Goswami, Assistant Professor, Department of Physics, Midnapore College, West Bengal, India

Dr. Ratnesh Viswaksen, Assistant Professor, Department of Hindi, Ranchi College, Ranch, Jharkhand, India

Mr. Pushan Deb, Senior Advisory IT Architect, IBM

Cover Design: **Satyajit Ghosh**

Published by

Mala Palit

on behalf of Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

ISSN: 2348-6813

© Kharagpur Social Empowerment and Research Association (KSERA)

Communications

Bijay Palit, Editor, Gopalnagar, Jhapetapur, Kharagpur-721 301

e-mail: inquestjournal@gmail.com

Price: ₹ 150.00 $ 3

Content / সূচি

সংস্কৃতি চর্চায় তারাপদ সাঁতরা : জনচৈতন্য জাগরণের একটি পাঠক্রম
শ্যামল বেরা 7

ভারতীয় ধর্মে গুরুবাদ: প্রসঙ্গ মতুয়া ধর্ম
বিষ্ণু সিকদার 13

পুথিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান
ড. জয়া বিশ্বাস 20

National Education Policy (NEP 2020) : Prospects and Challenges
M. N. Goswami 26

দেশলাইয়ের বাক্স, দশটাকার নোট আর লোকবিশ্বাস : মৈথিলের মাঘিয়া কালী
ঋষি ঘোষ 30

Thus Spake Nilotpal Roy, A Literary Aficionado
Somnath Bhattacharya 38

Encountering the Bifurcated Self and Haunting Memory in Graphic Autobiography: An introspection into the panels of John Lewis's *March: Book One*, illustrated by Nate Powell
Tirtha Sagar Banerjee 45

শ্যামাসংগীত ও কালীসংগীত : চেতনার মাঝে অচেনা:একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান
দীপাঞ্জনা শর্মা 52

The Purificatory Ceremonies of Ancient India:
The Vedic Genesis
Soumik Piri 62

জঙ্গলমহালের উলগুলানে গণসঙ্গীত
ড. লক্ষীন্দর পালোই 68

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে কর্ম,ভক্তি ও জ্ঞানযোগ
মিলন দে 87

Book Review
A New Message and Dream for the Seekers
Rituparna Adak 90

EDITORIAL

In globalization when relationships have been rapidly breaking and individualism is appreciated; Inquest is sincerely feeling the need to be united with other institutions and organizations. In this process, Inquest is extremely happy to declare that we have extended our family to **Kharagpur College** through a MOU. From this issue Inquest will be brought out in collaboration with Kharagpur college.

Inquest started his journey in 2014; so he is almost entering into a decade with lot of ups and downs. In this long journey we are indebted to Dr. Prantosh Sen, retired Principal Gour Mahavidyalay,Malda and Professor Gopa Dutta, Jadavpur University. They guided us every step of the way in time to time. Our special thanks go to Professor Dr. Gopal Chandra Mishra- former Vice Chancellor of the University of Gour Banga, Malda for his sincere endeavour to push the Inquest a step forward.

In this new journey Inquest still prefers to stick to his old philosophy and outlook so far nurtured with a simple aim to extend the areas of research not only by academic fellows but by giving equal importance to the researches of non-academic freelance researchers outside academic boundaries.

The present issue of Inquest is designed as a general issue. It covers a wide range of subjects from a critical analysis of Tarapada Santra's field works-based on local history to a critical study on Shyamasangeet and Kalisangeet to explore a less visible domain of vakti sangeet with special reference to Tantrik Buddhisim; on the role of people's song in the mass movement of Jungle Mahal, an introspection into the Guruism in Matua sect, an offbeat narrative on Maithili Kali based on a sanctioned Research Project: "The origin and Development of Sakta Cult in the Selective Regions of Malda District (1500-1800" and so on.

Hope this issue too provide good thoughts to our readers and open new discourse regarding the topics. At the sametime, we unhesitantly admit that our endevour is not without our limitation, but we tried our level best and the rest will be on the judgement of our sincere readers.

সম্পাদকের কলমে

শ্রী সন্দীপ দত্ত, চিরজীবিতেষু

(১৯৫১ - ২০২৩)

সে তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ১৮ এম, টেমার লেনের গলির কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্রের অপরিসর ঘরগুলিতে অনেক গবেষকের শুরুর দিনগুলো কেটেছে। স্মৃতি খুব বিশ্বাসঘাতকতা না করলে তাঁদের অনেকের মনে পড়বে, সামনের টেবিলে একটা বেতের তৈরি হাঁসের মতো আকৃতির ছোট্ট ঝুড়ি থাকতো। যার যার যা যা রেফারেন্স দরকার,নাম লিখে ঐ হাঁসের পেটে ঢুকিয়ে রেখে আসা যেত। সকলে জানতো,যতো উদ্ভট বা দুষ্প্রাপ্য রেফারেন্সই হোক না কেন,পরবর্তী সপ্তাহে ঠিকই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। সকলে নিশ্চিত জানতো,আমাদের প্রজন্মে এনসাইক্লোপিডিয়া বা উইকিপিডিয়া না থাকলেও একজন সন্দীপ দত্ত আছেন।

শুধু গবেষকদের চাহিদামতো বইপত্র জুগিয়ে যাওয়া নয়, অনেকক্ষেত্রে তাঁদের কাজের গতিপ্রকৃতি জেনে কোন পত্রিকা বা বইয়ের সাহায্য তার গবেষণাকে আরো উন্নত করতে পারবে, সেই সম্পর্কেও পরামর্শ বিলোতেন অকাতরে। আজকের গবেষণার পরিভাষায় যাকে রেফারেন্স সার্ভিস বলা হয়, তাঁর কাজের ধরন ধারণ ছিল কতকটা সেইরকম। ১৯৭৮ সালের ২৩ জুন থেকে একার উদ্যোগে তিনি যা করে গেলেন, শুধু 'প্রতিষ্ঠান' আর 'প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা'র ছক দিয়ে তাকে বিচার করতে গেলে অন্যায় হবে।

'যুগসন্ধি' বলে বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া একটি বাংলা শব্দ আছে। সন্দীপ দত্তের চলে যাওয়া এই যুগসন্ধির সময়ে; যখন লিটল ম্যাগাজিন অধ্যাপক বা পিএইচডি গবেষক এর বৈতরণীর তরী হতে গিয়ে নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ফেলে তার ঢাউস চেহারা নিয়ে প্রবল উল্লসিত হচ্ছে-তার উদযাপন এবং আড়ম্বরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে তার মৌলিকতার সম্ভাবনা,বিজ্ঞাপন ও দেখানেপানার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল সত্ত্বা,দেওয়া-নেওয়ার ছকের হিসাবের বাইরেই থেকে যাচ্ছে তার ছকভাঙার আজন্মলালিত বিশ্বাস। এই কালবেলাকে কুর্নিশ জানিয়েই তিনি, 'নিঃসঙ্গ সম্রাট', রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেন। গবেষণা ও বৃহত্তর চর্চার জগতে লিটল ম্যাগাজিনের সম্ভাবনার সূত্রপাত তাঁর হাতেই, আর আজ লিটল ম্যাগাজিনের মৃত্যুঘন্টার আওয়াজ যখন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সেই সময়েই তাঁর চলে যাওয়া।

লিটল ম্যাগাজিন আদৌ অ্যাকাডেমিক জার্নাল হতে পারে কিনা,বা অ্যাকাডেমিক জার্নাল-এর মধ্যে লিটল ম্যাগাজিনের গুণ কতোটা এবং কীভাবে থাকতে পারে, এই তাত্ত্বিক তরজার ফাঁকে বাংলা সাহিত্যে ও গবেষণা আজ অন্তত একবার মাথা নিচু করে দাঁড়াক ঐ বেতের হাঁসের সামনে...তাকে মুছে দেওয়ার মতো ইরেজার মহাকাল কারো হাতে দিয়ে যাননি! যাঁরা কলার তুলে 'লিটল ম্যাগাজিনের লেখক' হিসাবে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সুবিমল মিশ্র বা বাসুদেব দাশগুপ্ত হয়ে থাকতে পারেননি; পাঁচ-দশ না হলেও পনেরো-বিশ নিলামের ডাকে বিকিয়ে গিয়েছেন বা যেতে বাধ্য হয়েছেন; বেছে নিয়েছেন প্রেমের বদলে আরাম, যন্ত্রণার বদলে শান্তি, স্বোপার্জিত শাকান্নের বদলে ক্রীতদাসের চর্বচোষ্য-তাঁরা জানেন, নিশ্চিত জানেন-লড়তে লড়তে জয় হলে, ঘষতে ঘষতে ক্ষয়ও হয়। সেই জয় ও ক্ষয়ের মধু আর বিষে মাখামাখি হয়ে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন যতোদিন থেকে যাবে; সন্দীপ দত্তও থেকে যাবেন।

সংস্কৃতি চর্চায় তারাপদ সাঁতরা : জনচৈতন্য জাগরণের একটি পাঠক্রম

শ্যামল বেরা*

বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রপথিক তারাপদ সাঁতরা যেভাবে সমাজ সংস্কৃতিকে দেখেছেন, যেভাবে সংস্কৃতির চর্চা করেছেন, তার মূলে নিহিত ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন। তারাপদবাবু আঞ্চলিক ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, পুরাতত্ত্বের যে চর্চা করেছেন, দেখা যাবে তার ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছিল জীবনের একেবারে প্রথম পর্বে। ১৯৬২ তে তারাপদ বাবু প্রণীত হাওড়া জেলার লোক-উৎসব গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা দেখব, বিশিষ্ট অধ্যাপক কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর এই কাজের ধারা যেন অব্যাহত থাকে এবং তিনি যেন আমাদের জনচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেন, তারাপদবাবুর সমস্ত কার্যক্রম এবং রচনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে— তার সমস্ত কাজের মূলে রয়েছে জনচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত পালন।

তারাপদবাবুর জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি। নিখিল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পটভূমি। অসহযোগ আন্দোলন-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা-জমিদারি প্রথা বিলোপের দাবি উত্থাপন— সাইমন কমিশন— আইন অমান্য আন্দোলন— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল— হিজলি জেলে বন্দীদের গুলি করে হত্যা— বিনয় বাদল দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং হানা— স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠার এই কালপর্ব। প্রেক্ষাপটে তারাপদ বাবুর জীবনের প্রথম পর্ব।

হাওড়া জেলার শালকিয়া থেকে বাগনানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই জীবনের একেবারে শুরু থেকেই। বাবা কাজ করতেন লোহা কারখানায়। শ্রমিক পরিবারের সন্তান। এগারো-বারো বছর বয়সেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকরতা, ৪২ এর আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন। বয়স যখন সতের, মার্কসবাদী ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বে চলে এলেন তারাপদ সাঁতরা, তখন অবশ্য লিখতেন 'তারা সাতরা' নামে। এই আন্দোলনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলেও আড়াই মাস থাকতে হয়েছে। জেলে থাকার কারণ, 'পথের আলো' পত্রিকা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। তারাপদবাবু ছিলেন পত্রিকাটির প্রকাশক ও মুদ্রাকর। মার্কসবাদী ভাবাদর্শের প্রচারক ছিল পত্রিকাটি। স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় পীড়ণের শিকার হন তিনি। ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। এই পর্বে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন— তেভাগা আন্দোলনে, খাদ্য আন্দোলনে ১৯৫০ এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও তিনি গোপনে তার কাজ চালিয়ে গেছেন। ১৯৫৭ তে 'সন্দেশ' পত্রিকাকে ঘিরে আবার বিতর্ক দানা বাঁধে। সে আর এক পর্ব। এই সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দিলেন। পার্টি ছেড়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু যে দীক্ষা পেলেন, সমাজ ও মানুষকে দেখার যে দর্শন পেলেন, সেই দর্শনের আলোয় তিনি দেখলেন আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও মানব সভ্যতার স্বরূপ। ফলে, তাঁর দেখার মূলে যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর কাছে আদর্শ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৯০৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া, ইতিহাস যে কি জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারেনা।' এই প্রবন্ধের আরেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'যেখানেই হোক-না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানবার একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা, তাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তি এমন একটা

INQUEST-KSERA/2384-6813/01

বিকাশ হয় যে কোন ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতে পারেনা।' 'স্বভাবতই আমরা দুটি ধারণা বেশ বুঝতে নিতে পারি'—

১. পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়া।

২. নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাইরে নানা স্থানে আমাদের চারপাশে যা প্রত্যক্ষ হয়ে আছে— তার আলোচনা করা

তারাপদ সাঁতরার কার্যক্রম এবং সৃষ্টিতে এই দুটি ধারণা বিশেষভাবে কাজ করেছে। তারাপদ সাঁতরা প্রণীত গ্রন্থগুলির পাঠ পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি মূলত স্থানীয় ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ব চর্চার মধ্য দিয়ে, দেশের বহমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পাঠকেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯৬২ তে তারাপদ সাঁতরার প্রথম বই 'হাওড়া জেলার লোক-উৎসব'। তারাপদবাবুর বয়স তখন তিরিশ। এই বয়সেই তিনি স্থানীয় ইতিহাসের যে কাজ করলেন, তা হাওড়ার স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় দিক দর্শনকারী গ্রন্থ হিসাবে অবশ্য পাঠ্য একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে একটি জেলার লৌকিক দেবদেবী, লোকধর্মের রূপ-রূপান্তর, লোকজীবন ইতিহাস আমরা পাচ্ছি। গ্রাম্য দেবদেবী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে— পঞ্চানন্দ, দেবী বিশালাক্ষ্মী, চণ্ডী, ধর্ম নিরঞ্জন ও নাথ সম্প্রায়, শীতলা, দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজী। উৎসব পার্বণ পর্যায়ে রয়েছে— গাজন উৎসব, সয়লা উৎসব, এতেল ঠাকুরের উৎসব, ঘেঁটু ঠাকুরের উৎসব, অরন্ধন উৎসব, দীপাবলী উৎসব, পৌষ উৎসব। এছাড়া রয়েছে- বাররত, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি। হাওড়ার লৌকিক ইতিহাসকে এত নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করার ধারা তিনি প্রথম শুরু করলেন।

এই গ্রন্থের পটভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন— 'আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন ছাড়া দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না'। তারাপদবাবুর প্রত্যক্ষ অনুশীলন সম্পর্কে এই গ্রন্থের 'পরিচায়িকা' অংশে কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি খবই তাৎপর্যপূর্ণ— 'শ্রীমান তারাপদ'র জীবনচর্যায় সমাজ সম্পর্কে গভীর চেতনাবোধটি আমি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে লক্ষ্য করছি।...হাওড়া জেলার লোক উৎসবগুলি যে বাংলার প্রবাহমান জীবনচর্যার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং বাংলার সংস্কৃতিতে কত বিচিত্র রূপে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল তার পরিচয় এই পুস্তিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ...এ যেন সত্যিকারের গ্রাম্য মাটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলো।'

স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়ণের প্রধান সূত্র হলো 'সত্যিকার গ্রামের মাটির সঙ্গে পরিচয়' নিবিড় করা। কল্যাণবাবু সেই দিকটিকেই স্পষ্ট করে বলেছেন। 'ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ' গ্রন্থে তারাপদবাবু লিখছেন 'একালের গ্রাম্য জীবনে মেয়েলি ছড়ার জগত আজ শুষ্ক, পরিবর্তে সিনেমা থিয়েটারের বাজার চলতি গান এসে সেই স্থান দখল করেছে। কিন্তু তাহলেও যেসব লৌকিক ছড়া সেসময় প্রচলিত ছিল, সেগুলির মূল্য অপরিসীম। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যাওয়ায় তার পুরনো দিনের চেহারার একটা চিত্ররূপ যেন রয়ে গেছে এইসব ছড়া প্রবাদের মধ্যে। গ্রাম বসতিতে যে সম্প্রদায়ের একদিন ছিল প্রাধান্য, তাদের পরিচয়ও তুলে ধরতে পারে এইসব ছড়া প্রবাদ। প্রয়োজন বোধে এলাকার বৈশিষ্ট্যগত সাধারণ মানুষের শ্রেণী চরিত্র ও স্থান মাহাত্বের কথাও স্থান পেয়েছে। কত জনপদ, কত লোকালয়, কত হাটবাজার, গঞ্জ, কত জাতি গোষ্ঠী আর তার সংস্কৃতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই লৌকিক অবদান আজও পরিবর্তনের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিদিনের ফেলে আসা সেই জীবনের কাহিনী, সেই পুরাতন সমাজের ইতিহাস। তাই একান্তভাবেই বলা যেতে পারে, গ্রাম বাংলার এই ছড়া প্রবাদগুলি হল আঞ্চলিক লোকচেতনার গিরি নির্ঝর বিশেষ।'

ছড়া প্রবাদের মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রাম বাংলার এই পর্যবেক্ষণ, গ্রাম বাংলার স্বরূপ চিনিয়ে দেয়। এই ধারা আজ ক্রমশ লুপ্ত। তাই গ্রন্থের শেষে তারাপদবাবু বলেন, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকসাহিত্যের এই উপকরণের বহু কিছু আজ অজ্ঞাত রয়ে গেছে এবং কত যে বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দ্রুত

পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার ফলে বাঙ্গালীর আচার অনুষ্ঠান ও ধ্যান ধারণাতেও বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং এখনই এগুলির সন্ধান বা সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে, আমাদের লোকসাহিত্যের এই সুমহান ঐতিহ্য আমরা অচিরেই হারিয়ে ফেলবো,' তারাপদবাবুর এই সাবধান বাণী কি আমরা সেভাবে শুনেছি! কত জনগোষ্ঠীর পরিচয় এইসব ছড়া প্রবাদের মধ্যে নিহিত আছে; এগুলি যদি বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমাদের জনচৈতন্য নতুন করে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে বলেই বিশ্বাস।

১৯৬৯ এ প্রকাশিত তারাপদবাবুর একটু অন্য ধরনের গ্রন্থ 'শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য'। এ গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার পাঠ বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামতাবেড়ের স্থানীয় তথ্যের সমাবেশ। সামতাবেড় গ্রাম সমীক্ষার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে।

স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে তারাপদবাবুর একাধিক কাজ রয়েছে। ১৯৭৬ এ পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রকাশিত হলো 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি'। তথ্য সংকলন ও গ্রন্থনা করলেন তারাপদ সাঁতরা। সম্পাদনা অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটি স্থানীয় পুরাকীর্তি বা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। ১৪০ টি পুরাক্ষেত্রের সমীক্ষা রয়েছে এখানে। ধর্মীয়স্থাপত্যের সংখ্যা ২৩৪টি। এর মধ্যে ৬৮টি টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির। ভূমিকায় তারাপদবাবু লিখছেন— 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি নিদর্শন বিশেষ কিছু নেই এমনই অনেকের ধারণা। আশা করি বর্তমান গ্রন্থের সংকলিত ১৪০টি পুরাকীর্তি স্থলে বিশদ বিবরণ তাদের সে ভ্রান্তি দূর করবে।'

১৪০টি পুরাকীর্তির বিবরণ পেশ করার পূর্বে দীর্ঘ আলোচনায় কয়েকটি উপপর্ব রয়েছে। যেমন ভৌগোলিক রূপরেখা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, হাওড়া জেলা ধর্মীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। এইসব উপপর্বে স্থানীয় পুরাকীর্তি প্রত্নবস্তুর নিরিখে স্থানীয় ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিনি লিখছেন— 'হাওড়ার মন্দির প্রতিষ্ঠাতারা প্রধানত ছিলেন জমির উপসত্তসত্বভোগী, জমিদারের কর্মচারী অথবা রেশম, সুতীবস্ত্র, লবন, দুধ, মাদকদ্রব্য ও গুড় ব্যবসায়ী কিংবা পূজারী, কুল পুরোহিত প্রভৃতি।...এ জেলার দেবালয়গুলি প্রধানতঃ বাংলারীতির 'চালা', 'রত্ন', ও 'দালান' শ্রেণীর হলেও, 'নাগর' শৈলীর ওড়িশার বিবর্তিত রূপের সরলিকৃত পদ্ধতিতে কিছু কিছু 'শিখর' মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল।'

এইসব মন্দির মসজিদ গির্জার বিবরণের নানা সূত্র ধরে, টেরাকোটা ফলক ধরে, স্থানীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন তারাপদবাবু।

গ্রন্থের মুখবন্ধ-এ তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— 'সরল ভাষায় লেখা, বহু আলোকচিত্র শোভিত, স্বল্প মূল্যের এই গ্রন্থমালা প্রতিটি বাঙালিকে তার সুমহান পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে শুধু বিশদভাবে অবহিতই করবে না, উত্তরকালের গবেষকদের জন্যও পথ প্রস্তুত করে রাখবে।' ঠিকই বলেছেন তিনি। তারাপদবাবুর স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় উত্তর কালের গবেষকদের জন্য যে পথ প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা আমাদের অমূল্য পাথেয়।

'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি'র ধারায় ১৯৮৭ তে প্রকাশিত হয়েছে 'পুরাকীর্তি সমীক্ষা মেদিনীপুর'। তারাপদবাবু প্রয়াত হলেন ২০০৩-এ। ২০০৫-এ প্রকাশিত হলো 'জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি'। মাঝে ১৯৯৮-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'কলকাতার মন্দির মসজিদ: স্থাপত্য অলংকরণ রূপান্তর' (২০০২), 'কীর্তিবাস কলকাতা' (২০০১)। এইসব গ্রন্থে পুরাবস্তু, প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে স্থানীয় ইতিহাসের নানা কথা বলা হয়েছে।

'পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ' গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি হল— 'প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে সৌধ নির্মাণের প্রথা অব্যাহত রয়েছে। নগরায়নের অনিবার্য

অঙ্গ হিসেবে উপাসনালয়ও গড়ে উঠেছে। প্রাচীন অনেক সৌধ প্রাকৃতিক কারণে কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের আঘাতে আজ নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রায়। ...আমাদের বিশ্বাস, বইটি বাংলাভাষী মানুষকে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে সহায়তা করবে এবং তাহলেই মানব সভ্যতার অমূল্য সব সৃষ্টি সম্পদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে।'পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তার পর্যালোচনা করতে হলে এইসব গ্রন্থগুলি বড় সহায়ক।

পুরাকীর্তি চর্চার ধারায় তারাপদবাবুর আরও একটি বই 'মন্দির লিপিতে সমাজচিত্র'। প্রকাশকাল ১৯৮৩। তারাপদবাবু এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখছেন— 'পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত এমন অনেক মন্দিরের দেওয়ালে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপির মধ্যে যেসব অজানিত তথ্য আত্মগোপন করে আছে সেগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার ও বিশ্লেষণ হলে তা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান রয়েছে মন্দির লিপিতেও। এইভাবে তারাপদবাবু নতুন নতুন দিশা প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন। প্রত্নবস্তুর নিরিখে স্থানীয় ইতিহাসের যেমন নানা সূত্রের উল্লেখ করেছেন তিনি, তেমনি স্থানীয় ইতিহাস চর্চার আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে তার। গ্রন্থগুলি হল—

১. ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র (১৯৮১)

২. মেদিনীপুর: সংস্কৃতি ও মানব সমাজ (১৯৮৭)

৩. হাওড়া (২০০০)

৪. পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পসমাজ (২০০২)

৫. ইতিহাসের রূপরেখা: গ্রাম-জনপদ (২০০২)

৬. বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা: বাংলার সংগ্রহশালা (২০০২)

৭. বাংলার কাঠের কাজ (২০০৫)

প্রত্যেকটি কাজ অঞ্চল সমীক্ষা নির্ভর। সমীক্ষালব্ধ তথ্য নিয়ে গ্রন্থগুলি স্থানীয় ইতিহাসের আকর গ্রন্থ।

২০০২-এ 'হাওড়া' নামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল সুবর্ণরেখা থেকে। স্থানীয় ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। ১৩ টি অধ্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হল— 'প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ ও ইতিহাস'। কোন কোন অঞ্চলে কী কী প্রত্যক্ষ প্রত্ন পাওয়া গেছে, সেই সব উপাদানের বিবরণ ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, পাল-সেন যুগ থেকে একেবারে হাল আমলের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তিনি।

'হাওড়া' নামকরণ প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যার পর্যালোচনার সঙ্গে তিনি অন্য একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন, 'হাওড়া জেলার ক্ষেত্রেও আমরা জলজ শালুক গাছ থেকে শালিখা এবং কালকাসুন্দের গাছ থেকে কাসুন্দিয়া নামের যেমন ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছি, এমনি ষোলো শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত হারিড়া গাছের আধিক্যের জন্য সেখানের সাবেক নামকরণ হয়েছিল হড়িড়া বা হাড়িড়া, যা পরেই হাওড়া নামে রূপান্তরিত।'

স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় গ্রাম নামকরণের মধ্য দিয়ে তারাপদ সাঁতরার একটি তত্ত্ব রয়েছে। তথ্যটি হল 'নিশানদিহিতত্ত্ব'। নিশানা চিহ্নিতকরণ থেকে নামকরণ। যেমন আম গাছের নিশানা থেকে আমপোতা থেকে আমতা। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার কারণ, এ প্রসঙ্গে একটি বড় তর্ক-প্রতর্ক রয়েছে। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ৩০ বছর পর 'দেশ' পত্রিকায় (২৫ ফাল্গুন ১৩৭৪) পুনর্মুদ্রিত হয়। এর দু বছর পর 'এক্ষণ' পত্রিকায় ৩৬ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধে 'ভ্রমপ্রদর্শনাত্মক প্রতিবাদ' করেন

রাধারমন মিত্র। এরপর 'এক্ষণ' পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কার্তিক লাহিড়ী, তারাপদ সাঁতরা দীর্ঘ প্রতর্ক তুললেন। তারাপদ সাঁতরা দেখালেন— নগর কলিকাতা এবং হাওড়ার কলিকাতা স্থান নাম হয়েছে কলকেপোতা, কলকে গাছের তলা থেকে। আমি সেই দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণায় যাব না, আমার বক্তব্য এই, স্থানীয় ইতিহাস প্রণয়নে গ্রাম নামের ব্যাখ্যায় নানা সূত্র নিহিত থাকে। এক্ষেত্রে তারাপদ বাবুর এই 'নিশানদিহিতত্ত্ব'টি স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় অনেক প্রশ্নের উত্তর জানান দেবে বলেই মনে করি।

তারাপদবাবুর কিছু ধারাবাহিক রচনা রয়েছে। যে রচনাগুলি সাম্প্রতিক প্রকাশিত তারাপদ সাঁতরার 'রচনা সমগ্র'তে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাগুলি এরকম—

১. জীবন বীণা রাগ রাগিনী

২. একশো বারো পরগনার চিত্রপট

৩. হাঁটা পথে কলিঙ্গ

৪. কংসাবতী বয়ে চলেছে

ছোট ছোট ক্ষেত্র ধরে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার খুঁটিনাটি বিষয় লেখা হয়েছে এইসব ধারাবাহিক রচনায়। 'একশো বারো পরগনার চিত্রপটে'র লেখাগুলি এরকম— সিনেমার পর্দায় দুখু চিত্রকরের গ্রাম, পিডি সাহেবের ইস্তাহার, শিমূলপালের পাথর বাটি, কোলাঘাটের সেই জৈন মূর্তি, বার্জ সাহেবের সমন, কাঁথি-তমলুক মহকুমায় আগস্ট বিপ্লব ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, মেদিনীপুরের কাঁসা পিতলের কাজ, মন্দিরময় পাথরা ইত্যাদি।

শিরোনামগুলি দেখলেই বোঝা যায়, ছোট ছোট পরিসরের ইতিহাস এখানে বিবৃত রয়েছে। ছোট ছোট পরিসর যুক্ত করেই তৈরি হচ্ছে, তৈরি হতে পারে বড় ইতিহাস। ছোট ছোট পরিসর ধরে তারাপদবাবুর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ 'কৌশিকী' পত্রিকার সম্পাদনা। ২০০৩ এ কৌশিকী'র পুনর্মুদ্রণ হয়েছে দু'খণ্ডে। সংকলন ও বিন্যাস করেছেন দেবাশিস বসু এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। ভূমিকায় তাঁরা জানিয়েছেন— 'সরেজমিন সন্ধানের মাধ্যমে বঙ্গ সংস্কৃতির রূপ বৈচিত্র্য নথিকরণে গবেষক তারাপদ সাঁতরার উদ্যোগে ১৯৭১-এ আত্মপ্রকাশ করে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকংস্কৃতি বিষয়ক এক তুলনারহিত পত্রিকা: 'কৌশিকী' বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল রসজ্ঞ মহলে। প্রকাশের পারম্পর্য অনিয়মিত হলেও ৩৮ সংখ্যায় ১২২ জন লেখক মোট ৩১৮টি নিবন্ধে উন্মোচিত হয়েছিল বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্যের নানা দিগন্ত। বোঝাই যাচ্ছে কৌশিকীর পাতায় পাতায় বিবৃত রয়েছে আমাদের অঞ্চলচর্চার নানাকথা।

আমার আলোচনার শেষের দিকে আর দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব। একটি হলো— আজ যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে অর্থাৎ সেন্টার ফর আর্কেলজিক্যাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, এই সেন্টারে তারাপদবাবুর সংগৃহীত স্থানীয় ইতিহাস কিংবা প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক বইপত্র সংরক্ষিত হয়েছে, তারাপদবাবু যেসব আলোকচিত্র তুলেছিলেন, তার নেগেটিভ সহ অন্যান্য নথিপত্রের একটা অংশ এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এইসব নথিপত্রের বিশ্লেষণেও আমরা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনেক কিছুই জানতে পারবো। বলার কথা এই, তারাপদবাবু সংগৃহীত সম্পদ একেবারে হারিয়ে যায়নি। এজন্য আমরা এই সেন্টারের কাছে কৃতজ্ঞ।

আরেকটি বিষয়, সম্প্রতি কেউ কেউ বলেন— জনপ্রিয় ইতিহাস লেখা ঐতিহাসিক এর কাজ নয়, ঐতিহাসিক এর কাজ তথ্য নির্ভর ইতিহাস লেখা। 'সম্প্রতি ফেসবুকেও এইরকম একটি পোস্ট দেখছিলাম। ইদানিং আরও একটি প্রসঙ্গ শোনা

যায়— 'সরকারপ্রিয় ইতিহাস'। কিন্তু তথ্য যদি শাসকের ভুয়ো তথ্যের দাম্ভিকতায় পূর্ণ হয়, তথ্য যদি ধর্মীয় আগ্রাসনের হিংস্র থাবা হয়, তখন তো সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

জনপ্রিয় ইতিহাস, ঐতিহাসিকের রচিত ইতিহাস, সরকার প্রিয় ইতিহাস যাই হোক না কেন সঠিক এবং নিরপেক্ষ তথ্যের প্রয়োজন। এ নিয়ে আমার সামান্য উপলব্ধিথেকে বুঝেছি, ১৯৬২ থেকে ২০০৩ দীর্ঘ ৪০ বছর তারাপদবাবু যে চর্চা করেছেন, সেই চর্চার যাঁরা মূল্যায়ন করেছেন, কিংবা আমরা যারা সেই চর্চার পাঠ গ্রহণ করেছি, তাদের কাছে স্পষ্ট এই যে, স্থানীয় ইতিহাস কিংবা প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় তারাপদবাবু একটি স্বতন্ত্র স্বর।

পরিশেষে, 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে তারাপদবাবু সম্পর্কে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে মূল্যায়ন করেছেন, তা আরও একবার ফিরে দেখি— '...আমার কাছে তাঁর বড় পরিচয় তিনি প্রকৃত বঙ্গসংস্কৃতি প্রেমী। সে প্রেম তাঁকে লাইব্রেরীর আরামকেদারায় বসে ডক্টরেট হবার সহজ রাস্তায় নিয়ে যায়নি; নিয়ে গিয়েছে গ্রাম গ্রামান্তরের রুক্ষ ধুলোর পথে যেখানে অর্থাভাবে নিছক পায়ে হেঁটে তিনি শত শত মাইল পরিভ্রমণ করেছেন তাঁর জন্মভূমিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার ও চিনবার জন্য। 'এই প্রত্যক্ষভাবে দেখার ও চেনার মধ্যে নিহিত রয়েছে স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক সূত্র, তথা ইতিহাস নির্মাণের রত্নময় উপাদান সমূহ।

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে যেমন বঙ্গ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তারাপদবাবু দিয়েছেন, তেমনি সমসময়ের নানান ঘটনাবলীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'কৃষক ফ্রন্টে কাজ করতে করতে তখন আমাদের এখানে এভাবে আন্দোলন খুব দানা বাঁধ। এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সংগঠন করা হয়েছে যে, এবার থেকে ভাগচাষীদের তেভাগা দিতে হবে। এইসব ভাগচাষীদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মামলা-মোকদ্দমার তদবির করেছি একসময়। তাদের হয়ে কোর্টে দাঁড়াতে হতো, মামলায় লড়াই করতে হতো।'

আবার, বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস প্রসঙ্গে তিনি লোকায়ত পত্রিকার বিশেষ বুলেটিনে লিখছেন, 'আফগানিস্তানের মৌলবাদী মুসলিম তালিবান শাসকরা প্রায় ২০০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তিগুলিকে ধূলিসাৎ করে দিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামী ও রাষ্ট্রক্ষমতার তেজ দেখিয়ে। জানি, অসহায়ের মত দর্শকের ভূমিকায় আমাদের গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এইসব বর্বর রচিত ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হোক। ...এক্ষেত্রে আমাদের দেশের এইসব ধর্মান্ধ বর্বর মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির নানান দশকদের সংস্থা থেকে দূরে থাকায় হবে যথার্থ দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।"

এইভাবে তাঁর সৃষ্টিতে, তাঁর কাছে যে অভিমুখ তৈরি করেছেন, তা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চায়, তথা নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চায় এক স্বতন্ত্র পাঠক্রম।

* Dr. Shyamal Bera, Independant Research Scholar in Folk Culture and Local History.

ভারতীয় ধর্মে গুরুবাদ: প্রসঙ্গ মতুয়া ধর্ম

বিষ্ণু সিকদার*

সারাংশ: ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ে গুরুবাদের প্রভাব অপরিসীম। ধর্মের তত্ত্ব-দর্শন উপলব্ধির জন্য প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায়ে কিছু প্রায়োগিক দিক থাকে। সেই প্রায়োগিক দিকগুলো জানা, অনুশীলন করা এবং ধর্মীয় উপলব্ধিতে পৌঁছানোর জন্য একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। যিনি সেই পথপ্রদর্শক, ভারতীয় ধর্মে তাকেই বলা হয় গুরু। বাংলায় উদ্ভূত মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ে গুরুবাদ নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায়ে গুরুবাদ সম্পর্কে একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আলোচনায় ভারতীয় ধর্মাদর্শের প্রেক্ষিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে বোঝার চেষ্টা করা হবে।

বীজশব্দ: গুরুবাদ, মতুয়া ধর্ম, দেহতত্ত্ব, দীক্ষা, গোপন সাধনা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ব বাংলায় মতুয়া ধর্মের উৎপত্তি এবং পরবর্তী দশকগুলিতে তার ক্রমপরিণতি। দেশভাগের পর মতুয়া ধর্ম সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কম-বেশি বিস্তার লাভ করেছে। পুনর্বাসনসূত্রে পূর্ব বাংলার মতুয়া সম্প্রদায় ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং মতুয়া ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এবং তিরোভাব ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে এবং তিরোভাব ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় মতুয়া ধর্মের উৎপত্তি হলেও ক্রমে তা সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা থেকেই মতুয়া ধর্মের উৎপত্তি। প্রথম পর্যায়ে নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষেরাই ছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ। পরবর্তীকালে অপরাপর নিম্নবর্ণের মধ্যে মতুয়া ধর্ম প্রসার লাভ করে। আসলে হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় তাকেই বলা হয় মতুয়া ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরিণতি হল পৃথক মতুয়া সম্প্রদায়। মতুয়া ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখ্যায় করা হয়েছে (আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন এই পত্রিকার Vol-V, Issue-I, 2018) বর্তমান নিবন্ধে মতুয়া ধর্মে গুরুবাদ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বা আদৌ করতে পেরেছে কিনা তাই আলোচ্য।

ভারতের ধর্ম সম্প্রদায়গুলিতে গুরুবাদ একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। কোনো বিষয়ের ব্যবহারিক বা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী বা অগ্রসর ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত। তাতে জ্ঞানের প্রসার যেমন সহজ হয় তেমন তা হয় সময় সাশ্রয়ী। যেকোনো ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য। আর এই অগ্রসর ব্যক্তিকেই অভিহিত করা হয় গুরু বা শিক্ষক হিসেবে। ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়গুলিতেও শিক্ষক বা গুরুর অবদান ও অবস্থানকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের দুটি দিক থাকে। একটি তাত্ত্বিক বা দার্শনিক; অপরটি সেই তত্ত্ব দর্শন উপলব্ধির পথ প্রশস্ত করার জন্য কিছু ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ অথবা সেই তত্ত্ব বা দর্শনের ফলিত প্রয়োগ। এই ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবগতির জন্য প্রয়োজন গুরুর। পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মদর্শনের যাত্রাপথ রূপ থেকে অরূপে, মূর্ত থেকে বিমূর্তে। জটিল এই যাত্রাপথে প্রয়োজন একজন যথার্থ পথপ্রদর্শকের। এখন প্রশ্ন; কে হবেন এই পথপ্রদর্শক বা গুরু ? কি তার বৈশিষ্ট্য ? কতটা তার কাজের পরিধি ? একথা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে যুগে যুগে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কিন্তু সর্বতোভাবে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের একদল বলেছেন, ঈশ্বর উপলব্ধিতে গুরুর দরকার নেই। স্বশিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। স্বশিখনই সত্য

INQUEST-KSERA/2384-6813/02

শিখন। অবশ্য যারা এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন তারাই আবার ভিন্ন রূপে গুরুর আশ্রয় নিয়েছেন। এক ধরনের গুরুবাদকে নাকচ করে অপর এক ধরনের পরিমার্জিত বা রূপান্তরিত গুরুবাদকে আহ্বান করেছেন। গুরুবাদকে অস্বীকার করতে পারেননি। মতুয়া ধর্মে যারা গুরুবাদ বিরোধী তারা বলেন প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর কারো কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা নেন নি।[১] মতুয়াদের প্রধান গ্রন্থ *শ্রীশ্রী হরিলীলামৃতেও* গুরু প্রথার বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

শুদ্ধাচারী, বীজমন্ত্রী, নামে জপে মালা।
একা একা যেতে চায় সমুদ্রেতে ভেলা।।
গুরুরূপে ব্যবসায়ী কানে দেয় মন্ত্র।
প্রাণহীন দেহ যেন জুড়ে অঙ্গে যন্ত্র।।[২]

গুরুবাদের নামে ব্যবসাকে ধিক্কার জানিয়ে ভক্তদের সতর্ক করে অপর আকর গ্রন্থ *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিতে* বলা হয়েছে—'দীক্ষামন্ত্র দেয় গুরু কর্ণে মুখ রাখি।/হরিনাম মন্ত্র বিনা সব মন্ত্র ফাঁকি।।/মহামন্ত্র হরিনাম এই কলিকালে। নামের সহিত হরি নিজে হরি বলে।/পরম উদার এই হরিনাম মন্ত্র।/গুপ্ত মন্ত্র নহে ইহা শুদ্ধ স্পষ্ট শান্ত।।/কিবা সে গোপন মন্ত্র গুরু কর্ণে দেয়।/ দ্বার বন্ধ করি কভু দিন ভোলা যায়।'[৩] গুরুবাদ বিরোধীরা উক্ত পংক্তি সাক্ষী রেখে বলেন যে, এযুগে কোন গুপ্ত বীজমন্ত্র নেই। তা জানার জন্যেও কোন মানব গুরুর শরণাপন্ন হওয়ার দরকার নেই। এ যুগের একমাত্র মন্ত্র হরিনাম। **হরিনামই** সর্বসাধ্যসার। সাধারণত গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র গোপন রাখাই প্রথা। সেই প্রথা ভেঙে বীজমন্ত্রকে উন্মুক্ত করে দেয় মতুয়া দর্শন। অপর স্থানে বলা হচ্ছে, 'মতুয়ার এক গুরু ভিন্ন গুরু নাই।/ওড়াকান্দি প্রভু যিনি ক্ষীরদের সাঁই।।/মধ্যসত্ত্ব জমিদারী ধর্মক্ষেত্রে নাই।/ভিন্ন ভিন্ন দল কেহ করো না গোঁসাই।'[৪]

গুরুবাদ সম্পর্কে নেতিবাচকতার এ ধরনের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও গুরুবাদের অনুকূলেও মতামত খুবই জোরালো ছিল। বিশেষত মতুয়া সংগীত এ বিষয়ে মুখর। গুরুবাদের নামে ভণ্ডামীর প্রতি তীব্র ধিক্কার থাকলেও গুরু সম্পর্কিত আদর্শটি নাকচ হয়নি। পদকার অনধিকারী গুরুদের কটাক্ষ করে বলেছেন—

'গুরুতত্ত্ব করে ভরি গোঁসাই সেজেছে
গুরু কি ধন চিনলি না মন, সে রসে তুমি নি তাই মজেছ।
*   *   *
লোক ভুলাতে হরি কথা কও
অন্তরেতে দুষ্টু, মুখে মিষ্টি কথা কও।
কাজের কাজী নও, কপট সাধু হও,
গুরুতত্ত্ব পরমার্থ না জেনে গুরুর ভূষণ পরেছ।।'[৫]

এভাবে গুরুবাদের আদর্শবিচ্যুতিগুলি সমালোচিত হলেও প্রাচীন শাস্ত্রের অনুকূলেই গুরু সম্পর্কিত ধারণাগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে মতুয়া ধর্মে।

বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তর্গত *গুরুগীতায়* আছে—'গুকারশ্চানন্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।।অজ্ঞান ধ্বংসেকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়।।'[৬] অর্থাৎ 'গু' অর্থে অন্ধকার। 'রু' অর্থে তেজ (আলো)। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করে যিনি আলোর পথে নিয়ে যান, তিনিই গুরু। মতুয়া পদকারও অনুরূপভাবে বলেছেন 'গুরু বলতে দুটি অক্ষর হয়, গু বলিতে চিত্তগুহা তমঃরাশিময়/

রু বলিতে রবির উদয় হলে, আর আঁধার থাকে না।'[৭] গুরুর মর্যাদা সম্পর্কে *গুরুগীতা* বলছে, 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।/ গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরোবে নমঃ।।'[৮] একইভাবে মতুয়া তাত্ত্বিক লিখছেন, 'গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।/ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু সবার উপর।।'[৯] মতুয়া সাধন সংগীত ও মতুয়া আকর গ্রন্থাদি পাঠ এবং একাধিক সাধকের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান গবেষক যে কয়েকরকম গুরুর ধারণা পেয়েছেন, তা এইরকম—

ক) গুরুরূপী মানব

খ) গুরুরূপী ভগবান

গ) গুরুরূপী সাধনসঙ্গিনী

ঘ) গুরুরূপী অন্তরাত্মা বা মনগুরু

গুরু সম্পর্কিত ধারণায় এই বৈচিত্র ভারতের প্রায় সব ধর্মসম্প্রদায়ে আছে। যেমন তন্ত্রসাধক বলছেন, 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।/ মন্মাথঃ সর্বাভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।'[১০] অর্থাৎ যিনি আমার নাথ, তিনি জগতের নাথ; যিনি আমার গুরু, তিনি জগতের গুরু; যিনি আমার আত্মা, তিনি সর্বভূতের আত্মা; সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।[১১]

দেখা যাচ্ছে যে আত্মা, মানব, ঈশ্বর— সবার সঙ্গেই গুরু একাকার হয়ে যাচ্ছেন। মতুয়া সাধনায় আমরা এই ভাবটি প্রত্যক্ষ করি। ঈশ্বর উপলব্ধি বা সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য একজন সৎ (সদ্) গুরুর আশ্রয় কাম্য। হরিচাঁদ-পুত্র গুরুচাঁদ তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সৎ গুরুর আশ্রয় নিতে প্ররোচিত করেছেন। গুরুচাঁদ মনে করতেন *শ্রীশ্রী হরিলীলামৃতের* রচয়িতা সাধক কবি তারকচন্দ্র সরকার একজন যথার্থ গুরুর গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর পরামর্শে সমকালীন বহু ভক্ত তারক সরকারকে তাদের গুরুপদে বরণ করেছিলেন। রসরাজ তারকচন্দ্র সরকারেরও গুরু ছিলেন। হরিলীলামৃতে বলা আছে, 'তারকের জন্মদাতা পিতা কাশীনাথ/মাতা অন্নপূর্ণা দেবী তস্য গর্ভজাত/গুরু মৃত্যুঞ্জয় গুরুমাতা কাশীশ্বরী/নামে নামে মিশামিশি এই জ্ঞান করি'[১২]। রসরাজের গুরুভক্তিও ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি লিখছেন, 'গুরু তরুমূলে আনন্দবাজারে থাকি, ভবে লোভের হাটে আর কি ঢুকি'[১৩]। অপর এক সাধক কবি অশ্বিনী সরকারের গানে স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুরের গুরুর প্রসঙ্গ আছে। কবি লিখছেন, 'প্রভুর (হরিচাঁদ) পিতা হল যশোবন্ত শুদ্ধশান্ত একান্ত সদাশয়/প্রভুর দীক্ষাগুরু রমাকান্ত গো যার বরেতে জন্ম লয়'[১৪] মতুয়া সাধক কবিদের রচনাতে গুরুবন্দনার বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ পদের শেষে গুরুর প্রতি বিনতী দেখা যায়। উপরন্তু গুরুকে দয়াল, পারের কাণ্ডারী প্রভৃতি সম্বোধনে সম্বোধিত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে গুরুকে দেবতারাও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

মতুয়ারা কখনো কখনো ভগবানকেই আপন গুরু বা পথপ্রদর্শক রূপে বরণ করেন। তাদের মতে ভগবান স্বয়ং অলক্ষে থেকে পথনির্দেশ করেন। আপনার উপলব্ধিতে বা অন্তরাত্মার মাধ্যমে তিনি ধরা দেন। সেখানে মধ্যবর্তী কোনো মানবগুরুর প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো মতুয়া তাত্ত্বিক নিম্নের পংক্তি উদ্ধার করে একথা প্রমাণ করতে চান, 'মতুয়ার এক গুরু ভিন্ন গুরু নাই/ওড়াকান্দি প্রভু যিনি ক্ষীরোদের সাঁই'[১৫] অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণাবতার ভগবান হরিচাঁদই মতুয়ার একমাত্র গুরু। ভগবানরূপী সেই গুরুর উদ্দেশ্যে কবি বলেন—

হরি আমি তোমায় চিনলেম না রে।
আমি মায়াজালে বন্দী হয়ে; সাধের জনম যায় রে।।
গুরুরূপে হরি তুমি এসে সংসারে।
তুমি হরি হয়ে হরি বলে নাম দিলা সকলেরে।।[১৬]

মতুয়া পদের বিশ্লেষণে আর এক ধরনের গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হলেন সাধনসঙ্গিনরূপী গুরু। দেহতত্ত্বের পদগুলিতে এ ধরনের গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। সহজিয়া বৈষ্ণব বা বাউলদের মধ্যে প্রকৃতি (নারী) কেন্দ্রিক সাধনা প্রচলিত। মতুয়াদের সাধন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি-কেন্দ্রিক সাধনার বিশেষ চল নেই। উল্টে বিরোধিতাই আছে অথচ বহু মাতুয়াপদে পদকাররা প্রকৃতি-কেন্দ্রিক সাধনার পথনির্দেশ করেছেন এবং প্রকৃতি বা সাধনসঙ্গিনীকে ক্ষেত্রবিশেষে গুরু হিসেবে বরণ করেছেন। মতুয়া তত্ত্বগ্রন্থেও তার সমর্থন পাওয়া যায়—

> গু-কারেতে চিত্তগুহা অন্ধকারময়।
> যতদিন গুরু শক্তি হৃদে না বর্তায়।
> রু-কারেতে রবি উদয় শাস্ত্রের কাহিনী।
> অন্ধকার করে নাশ রাধা ঠাকুরানী।।[১৭]

বলা হচ্ছে, অন্ধকার নাশ করে রাধা ঠাকুরানী। আর অন্ধকার যিনি নাশ করেন তিনিই তো গুরু। উপরিউক্ত পংক্তিগুলির গূঢ় দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। দেহাত্তবাদীরা মানুষের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে চান। ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বাদ গ্রহণই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের মতে বস্তু জগতে নারী বা প্রকৃতি *স্বরূপে* (প্রকৃতপক্ষে) রাধা বা শক্তির আধার এবং পুরুষ হলো কৃষ্ণ বা শিব। প্রকৃতি সহায়তা বা স্পর্শ ব্যতীত পুরুষ বা শিব অচঞ্চল; জড়। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন দ্বারা এক অনির্বচনীয় প্রেমানুভূতি বা আনন্দময় শিহরণ উপলব্ধিই দেহাত্ববাদী সাধনার মূল। মোক্ষ নয়, *প্রেমরতন* লাভই লক্ষ্য। এই *প্রেমরতন* লাভ বা ওই আনন্দময় অবস্থায় পৌঁছতে তারা নারী সঙ্গিনী নিয়ে নিয়ন্ত্রিত দেহমিলন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যান। ভারতীয় তন্ত্র, বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম—সর্বত্রই নারীকেন্দ্রিক বা বলা ভালো যৌনচেতনাকেন্দ্রিক সাধনা প্রচলিত। নারীর ভূমিকা সেখানে তত্ত্বগতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে গুরুর মান্যতা দেওয়া হয়। 'এদের বিশ্বাসের বিচিত্র জগতে গুরু অগণন। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু ছাড়াও নিজের শ্বাস-ও গুরু এবং ভজনসঙ্গিনী নারীকেও (তাকে বলা হয় *শ্রীরূপ* বা *রূপ* এবং রূপকে ধরেই *স্বরূপের* বোধ জাগে) গুরু বলা হয়। তাই গানে আছে: ভজন সাধন করবি রে মন কোন্ রাগে/ আগে মেয়ের অনুগত হও গো। এবং আল্লা হরি ছেড়ে ভবে ভজ শ্রীগুরুর চরণ/গুরু ধর খোদকে চেনো।'[১৮] অর্থাৎ শ্রীগুরু/ শ্রীরূপ/রূপ প্রভৃতি শব্দের আড়ালে সাধনসঙ্গিনী নারীকে নির্দেশ করা হচ্ছে। মতুয়া পদকারও একটি পদে অনুরূপ চমৎকারিত্বে সাধন প্রক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করছেন—

> করণ যুদ্ধ কর ধনুক ধরো শ্রীগুরুর সনে।
> আপন মন হলে সই সমরে জয়ী হবি মন শঙ্কা কি আছে মনে।।
>
> * * *
>
> সমরেতে হয়ে সাবধান, ভক্তিবান হান গুরুর চরণে।
> করণ যুদ্ধ করে গোলকচাঁদ, হরিচাঁদকে প্রাপ্ত হল পেতে প্রেমের ফাঁদ।[১৯]

—দেহবাদী সাধনতত্ত্ব বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে এই *হরিচাঁদ* ভক্তের ভগবান হরিচাঁদ নন, ইনি হলেন দেহাবাদীদের *সোনার মানুষ, সহজ মানুষ* হরিচাঁদ; যাকে পেতে সাধন সঙ্গিনীরূপ গুরুর সঙ্গে যুগল সাধনার প্রয়োজন যা **করন যুদ্ধ** নামক পারিভাষিক শব্দগুচ্ছ দ্বারা চিহ্নিত।

মতুয়া সাধন তত্ত্বে কখনো বলা হয় যে সমস্ত গুরুর শ্রেষ্ঠ গুরু অন্তরে বাস করেন। দেহাত্ত্ববাদীরা যেমন বলেন—

'আগে দেহের খবর জান গে রে মন।/তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।/দেহে সপ্ত সর্গ, সপ্ত পাতাল/চৌদ্দভুবন কর ভ্রমণ।।/ দেখ না খুঁজে কোথায় বিরাজে/তোর পরম গুরু আত্মরাম'[২০]

এ প্রসঙ্গে তন্ত্রসাধক নিগূঢ়ানন্দের কথা মনে পড়ে। তিনি জনৈক সাধকের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে—

— আমার গুরু কে? কোথায় পাব?

— গুরু যিনি আছেন, তিনিই তোর গুরু। ঘরে বসেই পাবি।

— গুরুর সন্ধান না করলেও?

— হ্যাঁ রে, জমিতে যদি শস্য ফলাতে হয়, তবে জমি কৃষকের কাছে যায় না, কৃষকই জমির কাছে আসে। গুরুর জন্য আবার বাইরে যেতে হয় নাকি। সৎ গুরু হলেন সৎ কৃষক। জমি খুঁজে বেড়ান। ভালো জমি দেখলেই চাষ করে বীজ দেন। তিনিই দেখবি খুঁজে খুঁজে কাছে আসবেন। আসলে কি তিনি যে তোর কাছেই আছেন। সময় হলে আপন মনে বসে বসে তাঁর নির্দেশ পাবি। সব হবে তোর নিজের মন থেকে, বাইরে থেকে নয়।[২১]

দেহের মধ্যে আত্মরূপী গুরুর সন্ধানে নিবিষ্ট মতুয়া সাধকও। মনগুরুই তার সাধনপথের উপক্রমণিকা তৈরি করে। তাই পদকার লেখেন, 'মনগুরুর সহযোগে স্থূলের ঘর বাঁধ আগে/প্রবর্তে অনুরাগে ফেলাও মনের কপাট খুলে।।'[২২] 'মুলে গুরু কোন মানব দেহধারী গুরু নয়, তিনি স্বয়ং আত্মা। সাধনের প্রথম অবস্থায় বা তাহার পরবর্তী অবস্থায় গুরুর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সিদ্ধসাধক শিষ্যকে সাধনপথে অনেকখানি অগ্রসর করাইতে পারেন মাত্র কিন্তু আত্মস্বরূপের উপলব্ধি নিজের দ্বারাই সম্ভব।[২৩] তাই মনই পরম গুরু।

মতুয়া ধর্মে গুরু শিষ্যের আরেক প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান যা অনেকখানি অভিনব। পূর্বাপর ভারতীয় শাস্ত্রে গুরুকে শিক্ষক, পিতা, ঈশ্বর বা সাধন সঙ্গিনী রূপে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গুরুকে পতি রূপে ভজন করা অভিনবত্বের দাবি রাখে। একটি উদাহরণ—

> গুরুপতির বসে বামে
>
> ও তোর এদেহ দক্ষিণা দিয়ে যেওনা দক্ষিণাশ্রমে।
>
> * * *
>
> তারকচাঁদের বাক্য ধর, গুরুপতি বরণ কর,
>
> স্বামী মহানন্দের দয়া বড়, অশ্বিনী কেন ডুবিল ভ্রমে।।[২৪]

এই দৃষ্টান্ত মতুয়াদের স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণস্বরূপ। এমন দৃষ্টান্ত সাধারণত বৈষ্ণব-শাক্ত-বাউল প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ে পাওয়া যায় না। মতুয়ারা বলেন 'গুরু কৃষ্ণ অভেদআত্মা'[২৫]। আবার গুরুর সঙ্গে তাদের প্রেম সাধারণ প্রেম নয়, সমর্থা প্রেম। সাধক বলেন, 'গুরু আমার থাকুক সুখে আমি যেন কাঁদি দুঃখে/কাঙ্গাল বেশে করব ভিক্ষে, গুরুর গুণ গেয়ে বেড়াব।'[২৬]

এমন গুরু নির্ভরতা সত্ত্বেও গুরুবাদ নিয়ে মতুয়াদের আভ্যন্তরীণ বিতর্কটি তীব্রতর হয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুর থেকে শুরু করে বিনাপাণি দেবী, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর বারবার গুরুবাদ বিরোধী মন্তব্য করেছেন। মতুয়া মহাসংঘের দীর্ঘকালের সাধারণ সম্পাদক গণপতি বিশ্বাসকে প্রচার করতে হয়েছিল যে মতুয়াদের গুরুগিরি নেই[২৭]। *রূপসংগীত* নামক গ্রন্থে বিশেষ টিকা

লিখে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে *গুরুর* অর্থ *দীক্ষাগুরু* নয়, *গুরুচাঁদ ঠাকুর*।

কেন এই দোটানা? আসলে গুরুবাদের ইতিবাচক ও অবশ্যম্ভাবী পথ ধরে *গুরুগিরি* নামক ব্যবসা বহুকাল ধরে চলে আসছে। কুলগুরু, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু প্রভৃতি নানা স্তরের গুরু দ্বারা ব্যূহবিদ্ধ ছিল সাধারণ মানুষ। এসমস্ত গুরুরা কানে মন্ত্র দিতেন। মন্ত্র প্রদানের অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদের। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণজাত বৈষ্ণবেরাও সে অধিকার লাভ করে। মন্ত্রদানের কারণ বা তত্ত্বটি ছিল এইরূপ, 'যোনিপথে জন্মবশত দেহ নাকি অশুচি হয়। আর এই অশুচি দেহ নিয়ে সাধনে সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভ কিছুই হয় না। স্বর্গসুখও লাভ করা যায় না। তাই দেহকে পবিত্র করার জন্য, কানে বীজমন্ত্র প্রদানের যে পদ্ধতি তাই দীক্ষা।'[২৮] আর যারা বীজমন্ত্র প্রদান বা দীক্ষা দিতেন তারা বদলে ভালোরকমের দক্ষিণাও নিতেন। তাছাড়া গৃহস্থের পূজপার্বণ, যাগযজ্ঞ, উৎসব অনুষ্ঠানে গুরুদের ছিল অবাধ আমন্ত্রণ এবং যথারীতি দক্ষিণা গ্রহণ। অর্থ বা অর্থকরী বস্তুর মাধ্যমে দক্ষিণা দান ছিল অবশ্যপালনীয়। এই প্রথার সৌজন্যে ক্রমে ক্রমে গুরুরা অন্ধকারনাশক না হয়ে অর্থাপহারক হয়ে ওঠেন। মতুয়া ধর্ম এই দুর্নীতি থেকে দরিদ্র ও বিশ্বাসী মানুষজনকে মুক্ত রাখার চেষ্টা প্রথম থেকেই করে আসছে। মতুয়া ধর্ম প্রবর্তনের এটাও ছিল একটি সামাজিক উদ্দেশ্য। মতুয়া আকরগ্রন্থগুলি বারবার ভক্ত-শ্রোতা-পাঠকদের এবিষয়ে সতর্ক করেছে। মতুয়া সাধক গুরুরাও এবিষয়ে সতর্ক ছিলেন। বড়ো বড়ো সাধকগুরুর কাছে গুরুদক্ষিণা ছিল কখনো কেবলমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা; কখনো কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন। ব্যক্তিগত লাভালাভের চিন্তা তারা করতেন না। কিন্তু সবাই তা ছিলেন না। কোথাও কোথাও নীতিহীনতা প্রবেশ করত। সেখানেই সতর্ক করে নিন্দা করে বলা হত—

গুরু সেজে, লোক সমাজে, দেখাতে চাস বাহাদুরী
ও তুই দেখগে খুঁজে, নিজের মাঝে রয়েছে তোর ছলচাতুরী।
গুরু নামে বিনা শ্রমে কুড়োতে চাস পয়সাকড়ি;
নিয়ে বচন বাচন, আর কত মন ! কুড়াবি ধন শিষ্যের বাড়ি।[২৯]

গুরুগিরি যাতে মাথাচাড়া না দেয় সে কারণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সতর্ক করা হতো মতুয়াদের। বর্তমানেও করা হয়। আর শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু বা কুলগুরুর ধারণা নাকচ করে কেবল সৎ বা সিদ্ধ গুরু– আধার যিনি করিবে উজ্জ্বল/তিনিই গুরু তাঁর কাছে আছে মোক্ষফল'— এই বার্তাটি জোরের সঙ্গে প্রচারিত। গুরুপদে মান্যতা দেওয়ার আগে পরীক্ষা করে নিতে বলা হয়েছে ভক্তদের। পদকার লিখছেন, 'গুরু তুমি করবে যারে, দেখবে আগে বিচার করে,/আছে কিনা ভুষা আর মধুর বচন শুনে,/করো না শ্রীগুরু গোঁসাই/গু শব্দে বুঝায় আঁধার, রু শব্দে জ্যোতির আধার,/ সেই জ্যোতি রয় মধ্যে যার,/তিনি ছাড়া গুরু অন্য নাই; তারে চিনে ধরতে পারলে, মানব জনম সফল হবে ভাই।"

অর্থাৎ বোঝা গেল যে মতুয়া দর্শন গুরুবাদী সাধনার বিরোধী নয়, গুরুগিরি বিরোধিতায় আগ্রাসী।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বিশ্বাস, কপিলকৃষ্ণ, *মতুয়া ধর্ম*, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর রিসার্চ ফাউন্ডেশন, কলকাতা ১ম প্র. ২০১২, পৃ. ১১৫
২. সরকার, তারকচন্দ্র, *শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, মতুয়া মহাসংঘ,* ঠাকুর নগর, উঃ ২৪ পরগণা, ৫ম সং, ১৯৯৩, পৃ. ৭৩
৩. হালদার, মহানন্দ, *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত*, মতুয়া মহাসংঘ, ঠাকুরনগর, উঃ ২৪ পরগণা।, ৩য় সং, ১৯৯৮, পৃ. ১৭
৪. তদেব পৃ. ৫৭৩-৭৪

৫. সরকার, অশ্বিনীকুমার, শ্রীশ্রী *হরিসঙ্গীত*, মতুয়া মহাসংঘ, উঃ ২৪ পরগণা ২০ শ সং, ২০০৭, গান নং-৭২
৬. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কম্পানি কলকাতা ৪র্থ সং, ১৪২২, ব., পৃ. ৩১৬
৭. সরকার, অশ্বিনীকুমার, *শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত , প্রাগুক্ত* গান নং- ১৩
৮. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল গান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১৭
৯. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ মাহাত্ম্য*, শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ মতুয়া মিশন, প্রকাশ অনু., চতুর্থ সং, তারিখ অনু, পৃ. ১৩ (অনু= অনুল্লেখিত)
১০. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৯৭
১১. তদেব
১২. সরকার, তারকচন্দ্র, *শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১৯
১৩. মোহান্ত ড. নন্দদুলাল, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্র. ২০০২, পৃ. ১৮৫
১৪. সরকার, অশ্বিনীকুমার, *শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত* , প্রাগুক্ত গান নং-১৯
১৫. হালদার, মহানন্দ, *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদচরিত*, প্রাগুক্ত পৃ. ২২
১৬. মতুয়া মহাসংঘ (সম্পা), *মতুয়া সঙ্গীত*, মতুয়া মহাসংঘ, উঃ ২৪ পরগণা, ১২শ সং, ২০০৮, গান নং-৭০
১৭. পাগল, শ্রীমৎ বিচরণ, *শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ* মাহাত্ম্য, প্রাগুক্ত পৃ. ২২
১৮. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা), *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা ৩য় মু., ২০১৭, পৃ. ৪৬
১৯. সরকার, অশ্বিনীকুমার, *শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত* , প্রাগুক্ত গান নং ৫৪
২০. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২৫
২১. নিগুঢ়ানন্দ, *সহস্রারের পথে*, দে'জ, কলকাতা, ২য় সং, ২০০৯, পৃ. ৫৪
২২. সরকার, অশ্বিনীকুমার, *শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত* , প্রাগুক্ত গান নং- ১৫০
২৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২২
২৪. সরকার, অশ্বিনীকুমার, *শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত* , প্রাগুক্ত গান নং-১১৩
২৫. তদেব গান নং-১৩
২৬. তদেব গান নং-৭৭
২৭. বর্তমান গবেষক ও গণপতি বিশ্বাসের সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।
২৮. হালদার, ড. নিত্যানন্দ, *শ্রী হরিদর্শন* (১ম খণ্ড), প্র. অনু, উঃ ২৪ পরগণা, তারিখ, অনু., পৃ. ৮১
২৯. মোহান্ত, ড. নন্দদুলাল, *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৭

* Dr. Bishnu Sikder is presently working as Assistant Professor, Department of Bengali at Khudiram Bose Central College, Kolkata. Area of Research: Matua Religion and Culture; Conctac: bishnu_sikder@rediffmail.com

পুথিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান

ড. জয়া বিশ্বাস*

সভ্যতার ঊষাকাল হতেই মানুষের জ্ঞান অন্বেষণের সূত্রপাত ঘটে, আর এই জ্ঞান অন্বেষণ পর্বকে অনুসরণ করে চলে জ্ঞান বিতরণের পালা। এরপর নানা আকার প্রকার ভঙ্গিতে, রেখায় ও অক্ষরে, চিত্রে ও ইতিবৃত্তের নানান স্রোত বেয়ে চলতে রইল জ্ঞান পরিবেশন। এই পরিবেশন চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে জমে উঠল মাটিতে, পাথরে, প্যাপিরাস, ভূর্জ্জ্য, তালপাতা ও তাম্রফলকে লেখা অসংখ্য পুঁথিপত্র এবং পরে ছাপার অক্ষরে কাগজের বই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীনকাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ার বাঁধাই— কত গছের ছালে, পাতায় কাগজে, কত তুলিতে,খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক কত প্রয়াস— বাঁদিক হইতে ডাইনে, ডাইন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হ'তে অন্য সারে...."।[১]

আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হল, '**পুথিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান**', তবে মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করার পূর্বে সংক্ষেপে পুথি বিষয়টি বুঝে নিতে চেষ্টা করব। বাংলা পুথি আমাদের সাহিত্য প্রবাহের মুদ্রণ পূর্ববর্তীযুগের ধারাবাহিকতার চিহ্ন বহন করে চলেছে। এই পুথি আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি থেকে দূরবর্তী, কিন্তু দূরবর্তী বলে এটি বর্জনীয় বিষয় নয়। এটি পৃথকভাবে মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। কারণ ছাপার পূর্ববর্তী সময়ে যে বিপুল সাহিত্যের সন্ধান মেলে তার সিংহভাগই পুথি নির্ভর সাহিত্য। সাহিত্যের আদি সমালোচকগণ পুথি-সাহিত্য নিষ্কাশন করে বাংলা সাহিত্যের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তারা বাংলার ঘরে ঘরে স্থান করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।[২]

পুথি হল আমাদের জাতীয় সম্পদ। সাধারণত হস্তলিখিত ধর্মীয় পুস্তককেই পুথি বলা হত। পারসিক 'পুস্ত' থেকে পুথি শব্দের উৎপত্তি। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে পুথি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে দেখিয়েছেন— পুথি সংস্কৃত পুস্তী > প্রাকৃত পোথি > হিন্দি পোথী আনুনাসিক উচ্চারণে পুথি অর্থাৎ হস্তলিখিত পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী'কে একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন— "পুঁথি শব্দের চন্দ্রবিন্দুর লোপে পূর্ববঙ্গের প্রভাব দেখিতেছি। উহাতে আমার সম্মতি নাই"। পুথিতে যে স্বতোনাসিকীভবন ঘটেছে তা রাঢ় ভাষার প্রভাবেই ঘটেছে। সুতরাং শব্দটি 'পুঁথি' নয় 'পুথি'।[৩]

পুথির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত ভূর্জ্জপত্রর, তেরেট পত্র, তালপাতা এবং অন্যান্য বৃক্ষ বাকল ইত্যাদি। সর্বাধিক ব্যবহৃত হত তালপাতা। ইংরেজ শাসনের প্রথমপর্বে যে সকল প্রাচীন পুথিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি প্রায়ই ভূর্জ্জপত্রে লেখা। তালপাতার পুথির সঙ্গে সঙ্গে দেশিয় ভাষা-সাহিত্যের জন্যে তুলোট কাগজের পুথির প্রচলন ছিল, তবে সর্বত্র এর প্রচার এরকরম ছিল না এবং সব শ্রেণির মানুষও তুলোট কাগজের পুথি ব্যবহার করতেন না। আধুনিকযুগে ক্রমশ তাল বা তেরেট পাতার পরিবর্তে তুলোট কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশ্চাত্য-গবেষকগণ প্যাপাইরাস ও পার্চমেন্ট পুথির বহু বিচিত্র উপকরণের সন্ধান দিয়েছেন।[৪]

পুথির মধ্যে ছবির ব্যবহার সম্পর্কে বলা যায় যে পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত পুথিতে বুদ্ধের অথবা বোধিসত্ত্বের অথবা যোগীসিদ্ধদের ছবি পাওয়া গেছে। এই পুথিগুলি হল আমাদের প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। মুসলমান অধিকারের পর বাংলাদেশে সচিত্র পুথি লেখার রীতি রুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু গুজরাট ও পাঞ্জাবে রীতিটি প্রচলিত ছিল। গুজরাটে জৈনরা, পাঞ্জাবে মুসলমানেরা সচিত্র পুথি লিখতেন। এই সচিত্র পুথির রেওয়াজ বাংলাদেশে আবার ফিরে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে, কিন্তু

INQUEST-KSERA/2384-6813/03

দু'একটি গীতগোবিন্দের অথবা ভাগবতের পুথি মধ্যেই সীমাদ্ধ থেকে যায়। পুথির মধ্যে ছবি না থাকলেও পুথির মলাটে অর্থাৎ পাটায় ছবি আঁকার রীতিটি প্রচলিত হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। পুথির পাটার ছবি সব সময় খণ্ডচিত্র নয়, তা আতত চিত্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।[৫]

পুথি সাহিত্যের বিধিবদ্ধ আলোচনার জন্য লিপিকরের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। লিপিকর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাংলা পুথির অধিকাংশ লিপিকর পুণ্যার্জণের উদ্দেশ্য স্থিরদৃষ্টি হয়ে কলম চালিয়েছেন, এমন নয়। প্রাচীনযুগেও এমন হয়নি বলেই মনে করা হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড ১১৭ অধ্যায়ে, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণশাস্ত্র লিখে ব্রাহ্মণকে দান করলে দেবত্বপ্রাপ্তি হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এরফলে হতে পারে পুণ্য অর্জন লিপিকরদের কাউকে কাউকে আকর্ষণ করেছে। তবে সর্বদা বিনা মাশুলে পুথি লিখিয়ে নেওয়া যেত না। ড. সরসীকুমার সরস্বতী পুথিদানের কিছু ঘটনা জানিয়েছেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমদিকে ফা হিয়েন পুথি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির কথা লিখে গেছেন। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বহু বিচিত্রদামে পুথির মালিকানা বদলের কাহিনি পুথির পৃষ্ঠাতেই পাওয়া গেছে। গবেষকগণ সেই সকল তথ্য আমাদের সম্মুখে এনেছেন। উনিশ শতকে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে পুথি সংগ্রহ শুরু হয়। তখন পুথি সংগ্রহ করতেন কিছু মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জনেরা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলার পুথিসাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা গেছে। এছাড়া ফেরিওয়ালারা বা পসারিনীদের পুথি সংগ্রহের বিবরণ সরবরাহ করছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ড. সুকুমার সেন ১৪৭ খ্রিঃ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন—
''বটতলার বই ফেরিয়ালারা আর এক মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে। বাংলা পুথির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাণ্ডার, যাহা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, তাহা ইহাদেরই তিলসঞ্চিত বল্মীক শৈল। এই সংগ্রহ করিয়াছিলে বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু। বটতলার হকাররা পাড়াগাঁয়ে বই বেচিতে গিয়া অনেক সময় নগদ মূল্য না লইয়া ছাপাবইয়ের বদলে পুরোনো পুথি লইয়া আসিত। ইহাদের নিকট হইতে এই সব পুথি কিনিয়া লইতেন নগেন্দ্রনাথ। এমনি করিয়াই বাঙালী সংস্কৃতির এই ভাণ্ডারটি উপচিত হইয়াছে।" চিত্রা দেব লিখেছেন, পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন বাঁকুড়ার সেই অজ পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে কলের সাদা কাগজ, পাঁচালী 'শিশুবোধক' জাতীয় বই নিয়ে আসত পসারিনীরা। তারা একরাশ পুঁথির বদলে দিত কিছু সাদা কাগজ। গৃহস্থেরা খুশি মনে ঘরের পুরোনো পুঁথির বিনিময়ে নতুন কাগজ কিনতেন।[৬]

পুথি সংগ্রহের পর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি হল পুথি সংরক্ষণ করা। পুথি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেলে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব, সুতরাং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে পোকায় কাটা পুথির পৃষ্ঠাগুলিকে ধূপনকক্ষে রাখতে হবে। পুথি রাখার স্থানটি সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক হতে হবে। এছাড়া বর্তমানে উন্নততর পদ্ধতি ব্যবহার করে পুথি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।[৭] পূর্বোক্ত এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির মধ্যে পুথি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আমরা মূল বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করব।

হাজার-এগারোশ বছর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সাহিত্যচর্চা ছিল মৌখিক এবং পুথি নির্ভর। হাজার বছর পূর্বের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদের পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নেপালে। এদেশে হাতে লেখা প্রাচীন পুথি পুনরুদ্ধারের প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন, ন্যাথালিয়েন ব্রাসী হ্যালহেড প্রমূখ। স্যার উইলিয়াম জোনস্ প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ঐতিহ্য সম্পন্ন কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন

১৭৮৪ খ্রিঃ। এখানে বাংলা, সংস্কৃত, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন পুথির ভাণ্ডার রয়েছে।[৮] চিত্রা দেব জানিয়েছেন, ১৮৮১ সালে সারদা লিপিতে রচিত 'ভাগশালী' পুথি ভারতে প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন পুথি বলে স্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশে ছাপাখানা আসার পর বইছাপার জন্য পুথি সংগ্রহে আধিক্য লক্ষ করা যায়। পুথি সংগ্রহের ব্যাপারে এদেশের মনিষীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া বই ছাপার উদ্দেশ্যে প্রকাশকরা রীতিমত পুথি সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে বিপুল সংখ্যক পুথি সংগৃহীত হয়।[৯]

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য এককথায় বিস্ময়কর। রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার স্পর্শে আমরা যে শুধু নূতন জীবনবোধেই উদ্দীপিত হয়েছি তাই নয়, পাশাপাশি আমরা মানবতা-বিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পেয়েছি সংগ্রামের প্রেরণাও। সংস্কৃত ও মানব জ্ঞানভাণ্ডারের এমন কোন শাখা নেই যা রবীন্দ্র প্রতিভায় আলোকিত নয়। শান্তিনিকেতনে পুথি সংগ্রহের সূচনা হয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ১৮৯৮-১৯০১ খ্রিঃ মধ্যে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৩২ খ্রিঃ শান্তিনিকেতনে পুথি বিভাগের সূচনা হয় এবং এরপর থেকে সংঘবদ্ধ ভাবে পুথি সংগৃহীত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পুথি সংগৃহীত হয়ে বিশ্বভারতী পুথিশালা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন পুথি বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন এবং পুথি উদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পুথিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত টীকা ও মন্তব্যের মধ্যে এবং তাঁর সম্পর্কে রচিত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের রচনার মধ্যে। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার: রবীন্দ্র উদ্যোগ' প্রবন্ধের প্রথমে 'সাধনা পত্রিকা'র 'সাময়িক সার সংগ্রহ' থেকে যে সম্পাদকীয়টি উদ্ধার করেছিলেন, সেখানে দেখা যায়, প্রাচীন পুথি উদ্ধার সম্পর্কে দেশবাসীর উদাসীনতা রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্দ করেছিল, আর সেই ক্ষোভ থেকে রবীন্দ্রনাথ পুথি উদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[১০]

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ত্রিশ, তখন তাঁর সম্পাদিত 'সাধনা পত্রিকা'র, 'সাময়িক সার সংগ্রহ' কলামে 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার' শীর্ষনামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পুথিচর্চায় আগ্রহ হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায়। শান্তিনিকেতনে পুথি বিভাগের সূচনার পর বিভিন্ন স্থান হতে পুথি সংগ্রহের পাশাপাশি পুথি সংরক্ষণের কাজও চলছিল। কিন্তু মাঝে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তারপর ১৯৪৬ সালে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সময় হতে পুথি সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয় বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায়। এই সময়ে দুজনে স্বনামধন্য অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন মহাশয় এই বিষয়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেছিলেন। শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়কে এই সময়ে পুথি সংক্রান্ত কার্যের জন্য নিযুক্ত করা হয়। ইনি অন্যান্য বহু পুথি সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রবীন্দ্রনাথ কর্মসচিব থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বেহালার চতুষ্পাঠী থেকে স্বামী জ্ঞানানন্দের সংগ্রহ পুথিশালায় নিয়ে আসেন। বিশ্বভারতীর বাংলা পুথিশালায় রক্ষিত 'যোগীর গান' নাম পুথিটি শিলাইদহ সন্নিহিত কুমারখালির বাউল সম্প্রদায়ের আখড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সংগৃহীত হয়। কলকাতা থেকে তিনি কিছু পুথি শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। এই সংগ্রহের ভাষায় কোন বাছবিচার ছিল না।[১১]

রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক থাকাকালীন (১৮৮৪ খ্রিঃ) সেখানকার পুথিগুলির সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগার থেকে সমাজের সভ্যগণ বিভিন্ন পুথি ও পুস্তক নিয়ে যথাসময়ে ফিরিয়ে দিতেন না। এদের উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৮৮৬ খ্রিঃ রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, যেখানে বলা হয়, যে সকল মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হতে পুথি ও পুস্তক পাঠ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছেন, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে এই মাঘ মাসের মধ্যে সমাজের লাইব্রিয়ানের নিকট প্রেরণ করেন।[১২] ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৩১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অভিভাষণে

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে পুথি বিষয়টির উপর জোর দিয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি ছাত্রদের পুথি সংগ্রহে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এই তথ্য সম্বন্ধেও অবগত করিয়াছেন যে, পুথি আমাদের জাতীয় সম্পদ যা তৎকালীন সমাজের তথ্যনিষ্ঠ দলিলচিত্র, যেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা বিশেষভাবেপ্রয়োজন। সভাপতি থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগারের বেশকিছু পুথি সাহিত্য পরিষদকে দান করেছিলেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পরিষদের কার্যবিবরণীতে লিখিত আছে— 'বৎসরের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একরাশি হস্তলিখিত পুথি পরিষদকে দান করিয়াছেন।' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সংস্কৃত পুথির সংখ্যাই বেশি, তবে ১৩১২ সালে কৃষ্ণদাস রচিত নভজীর ভক্তালের একটি বাংলা পুথি তিনি দান করেছিলেন। এটি তাঁরই ব্যবহৃত পুথি। এর কিছু কিছু কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা ও কাহিনির কবিতা রচনা করেছিলেন, যেমন— 'স্পর্শমণি', 'স্বামীলাভ', 'অপমানকর' ইত্যাদি। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের পুথিগুলি নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। এরপর ক্রমশ যখন শান্তিনিকেতন প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার কেন্দ্ররূপে পরিণত হতে লাগল তখন বিধুশেখর শাস্ত্রীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ নূতন করে শান্তিনিকেতনের জন্য পুথি সংগ্রহে মন দিলেন। এই ব্যাপারে বহু বিদ্বজ্জনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নেপালে যাওয়ার কথা ছিল নেপালের অমূল্য বৌদ্ধ পুথিগুলির প্রতিলিপি নিয়ে আসার জন্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে লেভির সঙ্গে যান শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত। এরফলে নেপালের রাজকীয় পুথিশালা থেকে বেশকিছু পুথিরপ্রতিলিপি শান্তিনিকেতনে আসে।প্রাচীন পুথি সংগ্রহের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সমবেতভাবে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্ত শাস্ত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিধুশেখরের পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ বরোদা লাইব্রেরী থেকে অনন্ত শাস্ত্রীকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ পারস্য ভ্রমণে গিয়ে পারসিক কবিদের একাধিক পুথি সংগ্রহ করে আনেন। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত সেই সব পুথিগুলি হল সুবিখ্যাত প্রাচীন পারসিক কবিদের কাব্য। যেমন— রুমির মসনবী, নিজামির পুথি, আনোয়ারী, দিওয়ানে ইত্যাদি।[১৩]

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণই বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য সম্পর্কে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নেপাল থেকে পুথি সংগ্রহ করে কখনও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়, কখনও লণ্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় অথবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। এদের মধ্যে বিশেষবাবে উল্লেখযোগ্য হল, চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য শান্তিদেব শিক্ষাসমউচ্চয়ের একমাত্র পুথি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে 'হাজার বছরের পূরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে যে চারটি পুথি প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম কৃষ্ণাচার্যের দোহা কোষ ও তার টীকা, এই বইটি বর্তমানে জাপানে।[১৪]

এদেশের বহুমূল্য যে পুথিগুলি রয়েছে তা যে ক্রমে এদেশের বাইরে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— 'আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসংকুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি তাহা নহে। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কতবড়ো একটা গালি তাহা আমরা অনুভব করি না।' এছাড়াও তিনি সাহিত্য পরিষদের সাংবিধানিক অধিবেশনে জানিয়েছেন যে, যে প্রদেশে সাহিত্য পরিষদের সাংবাৎসরিক অধিবেশন হবে সেখানে সেই প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃত সাহিত্য, লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা হতে থাকলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য যেমন সফল হবে, পাশাপাশি সেখানকার প্রাচীন

দেবালয় দীঘি ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুথি, পুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করে প্রদর্শনী হলে যে উপকার হবে তা বলাই বাহুল্য।[১৫]

প্রাচীন পুথি সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোন রকম বাছবিচার না করেই তা সংগ্রহ করতেন। তিনি যেমন পারস্য কবিদের পুথি সংগ্রহ করেছেন তেমনই মুসলমান কবিদের লেখা বাংলা পুথি সংগ্রহের ব্যাপারেও উৎসাহী ছিলেন। কলকাতার মেছো বাজার, গরাণহাটা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কবিদের লেখা ছাপা পুথি একসময় বিক্রি হত। এই রকম বেশ কিছু পুথি শান্তিনিকেতনের পুথিশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন— ভানুমতীর লড়াই, চন্দ্রবলীর পুথি, লজ্জাবতীর পুথি, সাতকন্যার বাখান, সতিবিবির কেচ্ছা, রাজকন্যা মধুবালা প্রভৃতি। কবি জসীমউদ্দীন লিখেছেন, ''এমন সময় রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শান্তিনিকেতন হইতে। খুড়ো (রবীন্দ্রনাথ)-ভাইপোতে (অবনীন্দ্রনাথ) ঘন্টার পর ঘন্টা মুসলমানী পুঁথি লইয়া আলাপ চলিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, পুঁথির একটি সংকলন বিশ্বভারতী হইতে ছাপাইবেন। পুঁথি সংকলনের খাতা বিশ্বভারতীতে চলিয়া গেল। সেগুলি হয়ত সেখানে পড়িয়া আছে, আজও ছাপা হয় নাই।''[১৬]

শুধুমাত্র পুথি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্ব পালন করেন নি, পুথি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বর্তমান সময় পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনেকসময় সম্পাদকগণ আধুনিককালের পাঠকদের বোঝার সুবিধার জন্য পুথি লিখিত বানান শুদ্ধ করে ছাপার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে এতে পুরানো বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক নমুনার বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকসময় হারিয়ে যেতে পারে। ১৩০৪ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী মুদ্রিত হলে 'ভারতী' পত্রিকার সাময়িক সাহিত্য বিভাগে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 'পত্রিকায় চণ্ডীদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। প্রাচীন গ্রন্থ সকলের যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান সংশোধন কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।[১৭] সম্পাদনার কাজে মনোনিবেশ করে বহু সম্পাদক বিচিত্র রকম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রমাণ রেখেছেন। এরা কোনক্রমে একটি পুথি পাঠ করে, তারপর সেটিকে আদর্শ করে যতগুলি সম্ভব পাঠভেদ দেখিয়ে যথেচ্ছাচার করে। রবীন্দ্রনাথ একেই কালাপাহাড় বৃত্তি বলতে চেয়েছেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ 'পহুঁ' শব্দের অর্থভেদ করতে গিয়ে এক সমালোচকের প্রতি প্রশ্ন করেছিলেন— 'আপনি মিথিলা প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে; এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোনো পুঁথিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়র্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও পহুঁ দেখি নাই; এবং কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।'[১৮] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পুথি সম্পর্কে কতখানি গভীর নিষ্ঠা ছিল এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি নিবিড় মনযোগী ছিলেন, পূর্বোক্ত বক্তব্যের মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র ১২৮৮ সংখ্যাতেও তিনি প্রাচীন কাব্য সম্পাদনার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেছেন।[১৯]

অবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অফুরন্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐতিহ্য পরম্পরা সমৃদ্ধ সম্পদকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও দশের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য নিহিত আছে প্রাচীন পুথি-পত্র মঠ-মন্দির ইত্যাদির মধ্যে'। তাই সময়মত এই সব অমূল্য বস্তুর যত্ন-রক্ষণাবেক্ষণ না করলে কালের স্রোতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। 'পুথিচর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান' বিষয়টি এত বিস্তৃত এবং এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের অভাব নেই। কিন্তু সীমিত পরিসরের মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ রেখে বলা যায়, পুথি চর্চায় সংগ্রহে, সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আমাদের অবাক করে এবং আমরা ধন্য হয়ে যাই তাঁর অবদান শিরোধার্য করে।

তথ্যঋণ

১. সাহা রামকৃষ্ণ সম্পাঃ, রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার তৎসহ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ: গ্রন্থপঞ্জী; কলকাতা; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ; ১৯৮৮ খ্রিঃ; পৃ. ৩৫।

২. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ. ৫।

৩. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.. ২৮৩, ৩৩১।

৪. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ.. ১৩,১৪,১৮।

৫. সেন সুভদ্রকুমার সম্পাঃ, বটতলার ছাপা ও ছবি সুকুমার সেন; কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স; জানু ২০০৮; পৃ. ২৯।

৬. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ.. ১৩,১৪, ২১-২৩।

৭. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ. ২১১।

৮. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ..১৮৭, ২৮৮।

৯. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.৩৩৬।

১০. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.. ২৮৩, ৩২২, ৩৬৬।

১১. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.. ২৮২, ২৯০, ৩২২, ৩২৪।

১২. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ. ২৮৪।

১৩. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.. ২৮৪, ২৮৫, ৩৩৫।

১৪. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.২৯০।

১৫. আচার্য বিকাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ সমগ্র, ২য় খণ্ড; কলকাতা; বিকাশ গ্রন্থ ভবন; ২০০৩; পৃ.. ৪০০, ৪০১।

১৬. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ.. ২৮৫, ২৮৬।

১৭. আচার্য অনিল সম্পাদঃ অনুষ্টুপ বিশেষ বাংলা পুথি সংখ্যা; কলকাতা; ১৪২২; পৃ. ২৮৬।

১৮. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ.. ১৫৯, ১৭৪।

১৯. বিশ্বাস অচিন্ত্য, বাংলা পুথির কথা; কলকাতা; রত্নাবলী; মে ২০০৩; পৃ.১৫৯।

* Dr. Jaya Biswas, Formar SRF. Jadavpur University, Department of Bengali, Kolkata, West Bengal, India.

National Education Policy (NEP 2020) : Prospects and Challenges

M. N. Goswami*

In 2020, the Central Government announced education policy that would make easy to taking over the education sector in our country by both domestic and foreign capital. Privatization and commercialization of education is the main goal of this reform. At the same time, the government has decided to implement its own sectarian agenda in the name of uniformity and integration of the curriculum and textbooks.

The central government has decided to implement this policy unilaterally without giving any opportunity for the public to protest in large numbers. They do not bother about the democratic practice in this implementation. They do not discuss the matter in Parliament or legislative assemblies, even with the academicians as well as students and teachers. They have taken the opportunity to declare the well contemplated policy in the Covid-19 pandemic situation.

The education policy declares that the center of higher education across the country should become an autonomous-self-financing institution accommodating a student population of about 3,000. Their self-financing, autonomous characters will gradually increase in line with the flexibility of the new policy without inviting any protest. Today's university system, which is affiliated with hundreds of colleges, will be phased out in order to create a conducive environment for that. The meaning of autonomy to the institutions means the autonomy to raise funds. Giving the right to award degrees to the respective institutions will ensure that every capitalist in the educational sector has the opportunity to brand his or her institution and thereby eliminate the possibility of non-competitive capital disappearing over time. The new education policy speaks out against the commercialization of education again and again, proposes to invite foreign universities to address the problem. By delegating responsibility for education to corporates, non-governmental organizations, parents' committees, and locally organized educational committees, the government will gradually dodge its responsibility for education. The document is rhetorical against reducing budget allocations for education, but has remained silent on how to address them.

The policy document reminds that India was once a world leader in higher education by enumerating some of the old Buddhist institutions as universities like Nalanda and Takshila. But the term "Research Institutes" or the frontier research organizations like ISI, Bose Institute or

INQUEST-KSERA/2384-6813/04

IACS at Kolkata, IISc at Bengaluru, and TIFR at Mumbai etc. who had brought glory (and even Nobel Prize) to India has been totally omitted in the entire document of the education policy 2020. But it is in the context of discussing the circumstances under which foreign universities can invest in India as well as the possibility of foreign students coming to study in India. In this way even tradition is presented as a commodity for the policy.

Like Special Economic Zone a similar commercial center is proposed as Special Educational Zone which generates private capital. Teachers and students will have no rights in such special educational zones for the environment or the betterment of study. In this connection it is to be said that, the discussion of the B.Ed curriculum deals with the fundamental duties; but it does not talk about fundamental rights. The concept of fundamental rights does not evolve generation after generation through this education policy.

Experiential learning or constructivism is the basis of school education according to the education policy which has been already implemented in some states like Kerala according to the guidelines from the World Bank. But the experiences from anywhere the said curriculum and pedagogy was implemented is with bitter consequences and the modern research shows that it is totally unscientific. This constructive mode of learning is built totally rejecting the scientific understanding and the functioning of the human brain in the creation and acquisition of knowledge. Many teachers have the confusion that the proposed constructivism and cognitive construction are one and the same and is a scientific project.

The education policy states about the equality and the need for inclusion, seeks to address that by pushing children into low-quality private education. The policy also outlines the opportunity of finding a list of retired teachers, retired government employees, alumni, volunteers, etc. who are willing to teach. It also sets forward the model of 'Gurukula' based education, 'Patashala' based education, or home-based education. The importance of formal education by adequately qualified teachers is rejected for the ages of 6 to14 years.

The policy proposes an opportunity for the financially deprived to end their education if needed by getting a few jobs at each stage, legitimizing the process by which students drop out of education through an entry-exit policy. It is argued that 'students are to be skilled in occupations according to their abilities', it means traditional jobs. University admission, including professional education, is regulated through public entrance exams, so only those who are financially able to study privately can get through. In our country today, there is a huge gap between the rich and the poor between the haves and the have nots. The education policy will accelerate that inequality.

Secularism and democracy are frequently stated in the policy. But the actual intention of the government is clear from the fact that the policy is put forward in a context when the chapters related with democracy and secularism have been removed from the syllabus. Since the scientific consciousness accepts or rejects any concept based on the evidence, when the government, which is vocal about scientific education, says that it will combine the Indian tradition with any kind of education (Indian Knowledge System), it is clear that, in a word, logic and science will disappear from education. In the introduction part of the document the names of the ancient scholars, intellectuals of the country-like Charak or Aryabhtta, have been cited several times in the text, but astonishingly the names of the founders of modern science like J. C. Bose, M. N. Saha, S. N. Bose, C. V. Raman, P. C. Mahalanabis, Homi J. Bhaba, M. Visvesvaraya, Shanti Swaroop Bhatnagar, or Birbal Sahni, D. P Khandelwall are completely absent in the document! Research in universities was aimed at promoting scientific, independent, rational and natural research. Though the new policy much focussed on the need for research; but that is research sponsored by the industries to bring-out market products.

In order to grip the objection against the 'lack of access to education' from the general people, the policy proposes to provide only vocational education to the poor and announce it as education. It is an arrangement that refutes education and employment to the people by creating the impression that if the labor force is developed, all will get jobs. Since the education policy of 1986, governments introduced a number of vocational courses. This created a lot of people who are skilled in different areas at the cost of basic education. But what happened to them? Did anyone get a job after that? That did not happen. Thus, vocational education became unacceptable to the people. Now in the present policy, it is said that the status of vocational education should be improved. How is that possible? By eliminating the distinction between curricular, cocurricular and extracurricular activities; eliminating the distinction between art and science; Eliminating the distinction between formal education and informal education; eliminating the distinction between academic education and sports, etc. This process has already been implemented in the different States and even in higher education sector. According to the education policy, in the name of improved vocational education, the need today is for vocational education to satisfy the needs of the market.

Even though the education policy 2020 is uttered about the importance of Indian languages and the teaching of Indian languages, the emphasis on teaching classical languages in India will create favourable conditions for backdoor entry of Sanskrit in the Hindi regions. The English medium will continue in private schools. On the contrary, much has been said about Indian languages

in order to bring back Sanskrit. At the same time, the new education policy seeks retaining and using local dialects as they feel they can sell India's diversity in trade for the benefit of the tourism industry.

The principles of federalism have been negating by declaring the policy unilaterally in the covid-19 pandemic situation. The policy has been declared without any consultation with the states, teaching community of different states. So, the unilateral declaration of policy shows the approach towards the federalism put forward by the Indian Constitution by the Central Government. It proclaims the autocratic nature of government.

In brief, the purpose of the education policy 2020 is not to provide universal, compulsory, scientific and secular education to the people. The government has gone one step further in the implementation of neo-liberal policies initiated by the Education Policy of 1986. The purpose of this education policy is to handover the accountability for education to private investment and to create mechanisms to control it.

Reference

1. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf

*Dr. Makhan Nanda Goswami is presently an Assistant Professor, Department of Physics: Midnapore College, West Bengal, India. Dr. Goswami is also a Science Activist and Editor of the popular Bengali Science Magazine 'Bigyan Trisha'.

দেশলাইয়ের বাক্স, দশটাকার নোট আর লোকবিশ্বাস : মৈথিলের মাঘিয়া কালী

ঋষি ঘোষ*

"...অ্যাজ পার ডিটেইলড ট্রাভেল লিস্ট ইউ মে ভিজিট রাখালকালী অফ শৈলপুর, জোড়াকালী অফ শৈলপুর, জোড়াকালী অব টিপাজানি, জগত্তারিণী সর্বমঙ্গলা কালী অফ কালিয়াচক বালুগ্রাম, কালী টেম্পলস্ অফ লস্করপুর অ্যান্ড হিলসামারি ভিলেজ আন্ডার রতুয়া পি এস, হরিশ্চন্দ্র কালীবাড়ি, গোর্বধন, গোবরজনা কালী অফ আড়াই ডাঙা, জহরাকালী (?) অ্যান্ড মা মনস্কামনা আন্ডার ইংলিশবাজার পি এস, ঝাপড়িকালী অফ বানপুর আন্ডার হবিবপুর পি এস, একবর্ণা অ্যান্ড উল্কা কালী আন্ডার শোভানগর পি এস, মা মুক্তকেশী অফ বাঙ্গিটোলা আন্ডার মোথাবাড়ি পি এস এটসেটরা ইন সার্চ অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড টারশিয়ারি ডক্যুমেন্ট, ইফ এনি"

যেখানে গল্পগুলো শুরুর আগেই শেষ...

রিসার্চ প্রোজেক্ট স্যাংশন হওয়ার চিঠিটা একঝলক দেখেই ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "যদি শেষ হয়, ভালো কাজ হবে"। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পটির শিরোনাম ছিলো: "দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ শাক্ত কাল্ট ইন সিলেক্টিভ রিজিয়নস অফ মালদা ডিস্ট্রিক্ট (১৫০০-১৮০০)"। কলকাতার একটি নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন রিসার্চ স্কলার খাতাকলমে যুক্ত ছিলেন এই প্রোজেক্টের সঙ্গে। ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘদেহী মণিস্যর, ইতিহাস গবেষক ড. তুষারকান্তি ঘোষ সিঁড়ির সামনের ধাপগুলোকে কীভাবে যেন দেখতে পেতেন! কোভিডে তাঁর চলে যাওয়ার খবর যখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সারা জেলায়; পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করে তার লেখাপত্র ও বইয়ের সংগ্রহ বাঁচানোর চেষ্টা করছে তাঁর মানসপুত্র আদর্শ মিশ্র, ঋষির মাথায় কে যেন পেরেকের মতো ঠুকে ঠুকে বসিয়ে দিচ্ছে তাঁর বলা কথার প্রথম অংশটা— 'যদি শেষ হয়...'

আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়...

"খুব তো মানসিংহের কালী নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিলি! মৈথিল গ্রামদেবকিদের নিয়ে কিছু জানিস? জানিস, যে মুক্তকেশী বা গোবরজনা কালী নিয়ে এতো মাতামাতি হয়, কোন কোন গ্রামদেবকির থান তার থেকেও অনেক পুরনো! কখনো ভেবে দেখেছিস, বাংলা-বিহারের বর্ডারলাইন মৈথিল মাইগ্রেশনের সঙ্গে সঙ্গে এই পারিবারিক পুজোগুলোরও মাইগ্রেশন ঘটেছে? এই পুজোগুলোর ক্ষেত্রে চার পুরুষ বা দেড়শো-দুশো বছর কোন ব্যাপার নয়... অন্য কিছু না, যে এলাকাটার কথা তুই বলছিস, তার নাম জোতকস্তুরী। এই 'জোত' শব্দটাই তো মুঘল আমলের ভূমিরাজস্ব বিভাগের চালু করা। দুটো বলদ আর একটা হাল দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতোটা চাষযোগ্য জমি কর্ষণ করা যায়, সেই এককেই বলা হতো জোত। এই স্থাননাম থেকেই তো প্রাচীনত্বের আভাস পাওয়া যায়। যা বললাম ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ— গৌড়ভূমির শাক্ত সাধনার ইতিহাসে এই মৈথিল গ্রামদেবকিদের বাইরে রেখে কি ভুল করেছি আমরা!"

শেষ ডিসেম্বরে মাঘী অমাবস্যার কনকনে মধ্যরাতে নদী আর শ্মশানের ধারে খোলা আকাশের নিচে পাটকাঠি আর খড়ির আগুন খুঁচিয়ে তোলার মতো উসকে উঠছিলো পুরনো কথাগুলো... ঢাক থেমে গেছে, বলির রক্তের উপর বালি ছড়িয়ে দিয়ে গেছে কেউ। ঋষির মনে হচ্ছিলো: ওর সামনেই বসে আছেন মণিস্যর— ড. তুষারকান্তি ঘোষ।

INQUEST-KSERA/2384-6813/05

হাম চান্দ পে রোটি কি চাদর ডাল কর সো জায়েঙ্গে...

"ঋষি, ফর গড'স সেক— ডোন্ট বি ওভারডিটারমাইনড ইন দিস সাবজেক্ট... তুমি যা বলছো, অ্যাজ সাবজেক্ট মৈথিল গ্রামের মাঘিয়া কালী ইজ ইন্টারেস্টিং-বাট রিমেম্বার, হাউজ ইজ নট গিভিং ইউ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। আমরা সবাই জানি: কালী তোমার প্রিয় বিষয়, অ্যন্ড ইউ হ্যাভ কমান্ড ওভার দ্যাট। কিন্তু বি ভেরি ইমপার্শিয়াল... নীলাদ্রির মতো কেউ বলতে না পারে— যা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, বাকি আছে একটা মৈথিল মেয়েকে বিয়ে করে নেওয়া।" অভ্যাস মতো নিউজ চিফের ধাতানি খেয়ে অফিসথেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ঋষি ভাবে— আবার একটা নন কমিশনড অ্যাসাইনমেন্ট ! স্টোরি ভালো হলে ক্রেডিট সবার আর খারাপ হলে দায় তার একার, সে তো চিরকালের 'আউটসাইডার'; চিরকালের 'ইনট্রুডার', চিরকালের 'ঘরেও নহে পারেও নহে..."

দুটো বাইকে ওরা তিনজন যখন মালদা টাউন ছাড়ছে, শীতের রাত সাড়ে দশটার রাজপথ প্রায় জনহীন। চাপ-চাপ কুয়াশা, অমৃতির ধাবার তড়কা-রুটি আর গরম চা পেরিয়ে এগোতে থাকে ওরা— সৌমেন্দু, হরষিত ও ঋষি। জ্যাকেট আর উইণ্ডচিটারের উপর হালকা সরের মতো কুয়াশা জমতে থাকে...শহর পিছনে পড়ে থাকে, ব্রেক আর ক্লাচের উপরে রাখা আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসতে থাকে; ঠাণ্ডার কামড় বাড়তে থাকে।

মৈথিল জনজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা সৌমেন্দু মনে করিয়ে দেয়, এই মাঘিয়া কালীপূজা ঐ অঞ্চলগুলিতেও বিশেষ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। মাইগ্রেশনের সময় এই সংস্কৃতিও সরাসরি সংবাহিত হয়েছে। উত্তরাধিকারীরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন রক্তের বিশুদ্ধতার সেই উত্তরাধিকার।

অন্যমনস্ক ঋষির হঠাৎ মনে পড়ে যায়— 'গামক ঘর' খ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অচল মিশ্রের আগামী সিনেমার কথা, যার কেন্দ্রীয় বিষয়ই শীতকালের দ্বারভাঙ্গার কুয়াশা। হিন্দি আর মৈথিলিতে একযোগে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির নাম 'ধুঁই', যার অর্থই কুয়শা। এই কুয়াশা যে কীভাবে নিজেই একটা চরিত্র হয়ে ওঠে, কুয়াশায় কীভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ— দর্শক তার সাক্ষী। আগের সিনেমাতেও ছটপূজার সময়কালীন কুয়াশা অচলের ক্যামেরায় মায়াবী হয়ে উঠেছিল।

ইস আঞ্জুমান মে আপকো আনা হ্যায় বার বার...

সেই যে সৌমেন্দু বলেছিলো, বাঙ্গিটোলার বয়স্ক পুরুষমাত্রেই তার মামা— এ তার মামাবাড়ির গ্রাম, সেই জগৎ পেরিয়ে যাওয়া গেল না। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মৈথিল গ্রামটিতে মা মুক্তকেশী মন্দিরের সামনের চাতালে তারা তিনজনেই কতোবার, কতোসময়ে এসে দাঁড়িয়েছে...পেশাদার রিপোর্টার হরষিত এসেছে খবর শিকারে ! ঋষিও সঙ্গী হয়েছে তার— সৌমেন্দুও এড়াতে পারেনি সেই আহ্বান। কিন্তু এই নির্জন মধ্যরাতে, যখন মন্দিরের সামনে বাঁধানো চাতাল ধুইয়ে দিচ্ছে হ্যালোজেনের আলো... গঙ্গার চর থেকে ভেসে আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর রাতচরা পাখির ডানার ঝটপটানি মিলেমিশে এক অতিপ্রাকৃত ধ্বনিতরঙ্গ আটকে রাখছে তিনজনকে, নীরবতা ভেঙে সৌমেন্দুই প্রথম বলে ওঠে— "আমাদের গোবিন্দগঞ্জ যেতে হবে"। ঋষির হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র বিশালাক্ষী মন্দিরের দেবীর মতোই মা মুক্তকেশী জড়িয়ে থাকেন এখানকার মানুষের সঙ্গে। সে-ই খুঁজে বের করেছিল: ১৮১৩ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ বায়োলজিস্ট ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের গবেষণাপত্রে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এই দেবীর অস্তিত্ব।

ভোগের নাম দোস্তি

সোয়া কেজি আটা দিয়ে বিনা তেল-লবণে তৈরি রুটি— সেই রুটি আবার সেঁকা হবে আমকাঠের জ্বালে। সঙ্গে বাঁধাকপি ও নতুন আলু মেশানো সবজি আর চিনি। তেল বা লবণের কোন সংস্রব নেই। এই ভোগের নাম দোস্তি। বাঙ্গিটোলার বাসিন্দা মলয়কুমার ঝা-র বাড়ির মাঘিয়া কালীর পূজায় এই ভোগ বাধ্যতামূলক। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মলয়বাবুর স্বর্গীয় পিতা শান্তিশেখর ঝা এই পূজার অধিকার লাভ করেন তাঁর মাতৃদেবী স্বর্গতা বরুণী দেব্যার কাছ থেকে। অর্থাৎ, এই অধিকার পিতৃকূলের নয়। মৈথিল সমাজের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক কৌমচিহ্ন মিশে রইলো এই উত্তরাধিকারের মধ্যে। থেকে গেল কিছু গভীর বিশ্বাস ও লোকজীবনের ইতিহাস; একটি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখ, অভাব আর মৃত্যু পেরিয়ে শুধু বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প...ওরা তিনজনেই নিজের নিজের মতো করে দেখে— ঝা পরিবারের সকলের চোখে মুখে বিশ্বাসের সেই অতিপ্রাকৃত আলো। ছোটবেলায় আবৃত্তিতে প্রাইজ পাওয়া সৌমেন্দুর মনে পড়ে যায় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা— “সে আলো টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে/তর্জনি তুলে জেগে থাকে ঘরে ঘরে”।

হরষিত ঘোষিত ভাবেই বলে— কবিতা বুঝি না। সে হার্ডকোর সাংবাদিক— একেবারে ফ্রন্টলাইন রিপোর্টার। তার মন পড়ে আছে মলয়বাবুর বলা একটা গল্পের দিকে। প্রাথমিকভাবে এই পরিবারে উদাসপূজা প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ, খোলা আকাশের নিচে বিনা মূর্তিতে কাঁচা মাটির থানে পূজিতা হতেন দেবী। পূজার আয়োজনের ব্যস্ততার ফাঁকে মলয়বাবু বলেন, একসময় এই ঝা পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। এমনকি মাঘ মাসের প্রথম অমাবস্যায় পূজা আদৌ হবে কি না, তা নিয়েও চিন্তিত ছিলেন শান্তিশেখর ঝা। তিন ছেলে আর তিন মেয়ের সংসারে অভাব ছিলো নিত্যসঙ্গী। পূজার জোগাড়ের জন্য যখন দিশেহারা অবস্থা, তখন হঠাৎই হাট থেকে ফেরার পথে অন্যমনস্কভাবে একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্স কুড়িয়ে পান তিনি। খুলে দেখেন— সেখানে ভাঁজ করে ঢোকানো আছে দুটি দশটাকার নোট! সাতের দশকের গোড়ায় সেই টাকা দিয়েই পূজার যোগাড় হয়। পারিবারিক বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়— এই পূজায় কোন ছেদ পড়বে না; পড়েও নি আজ অবধি।

সাংস্কৃতিক মাৎস্যন্যায়

“আমাকে পয়সা দিলেও ঐ রুই-কাতলা বড়ো মাছ খাবো না। নিজের হাতে ছোট ছোট মাছ ধরবো-সেটাই খাবো, নাতিটাকেও তাইই খাওয়াবো।”— পাটকাঠি, খড়ি আর কাঠকুটো দিয়ে আগুন করা হয়েছে; তার ধারে গোল হয়ে বসে আছে মানুষগুলো। এর মধ্যেই হরষিতকে কথাগুলো বলে ফেলেন এক প্রবীণ। আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে জনাদশেক ভাঙাচোরা চেহারার মানুষ। আশপাশের গ্রাম থেকে তারা এসেছেন পূজা দেখতে, প্রসাদ পেতে। দূর থেকে ক্যামেরার লেন্সে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ঋষির মনে পড়ে যায় ভ্যানগখের আঁকা ‘দ্য পটেটো ইটার্স’ ছবিটার কথা... একদম একরকম লাগছে! ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছবি নিয়ে পাগলামির সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তার।

সারা মালদা জেলায় গঙ্গার মাছের একধরনের বিশেষ কৌলীন্য আছে— ঋষি জানে সে কথা। ঝা বাড়ির এই পূজায় এসে তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় মিথিলাঞ্চলের সেই প্রাচীন প্রবাদ— “পগ পগ পোখর মাছ মাখান, মধুর বোল মুস্কি মুখপান/বিদ্যা বৈভব শান্তি প্রতীক, ললিত নগর হি মিথিলা থি।” অর্থাৎ, প্রতি পদক্ষেপে পুকুর বা জলাশয়, তাতে মাছ ও পদ্মের মাখনা; হাসিমুখে মিষ্টি কথা ও পান; বিদ্যাচর্চার শান্ত পরিবেশ ও সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার— এই সবকিছু নিয়েই মিথিলাঞ্চল ও মৈথিল জনসংস্কৃতি। ছোটবেলার ইতিহাস বইতে পড়া গৌড় সম্রাট শশাঙ্কের শাসন পরবর্তী ষোড়শ মহাজনপদের মাৎস্যন্যায়ের মতো, ক্রমাগত বড়ো মাছেরা ছোট মাছকে গিলে ফেলার মতো আধুনিকতার আগ্রাসনে উত্তরাধিকারের

ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে সরে যাচ্ছে এই অঞ্চলের মৈথিল জনসংস্কৃতির ধারা— সৌমেন্দু তার গবেষণায় এ কথাটা বারবার জোরের সঙ্গে বলার চেষ্টা করেছে। সে আর ঋষি একটা পর্যায়ে এসে একমত হয়েছে— এই অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি মৈথিলরা সর্বভারতীয় ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করেন; কিন্তু শাক্ত সাধনার একটা সাধারণ মৈথিল ঐতিহ্য এখানে আবহমানকাল থেকে রয়ে গেছে।

থার্মোকট, তার উপর জ্যাকেট, তার উপর উইন্ডচিটার— কিছুতেই শীত মানছে না। মলয়বাবুর দেওয়া লেপ-কম্বলও প্যান্ডেলের নিচের শিশিরে ভিজে সপসপে। মাঝে মাঝে গঙ্গার হাওয়া এসে একেবারে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। এই আগুনই একমাত্র ভরসা। সৌমেন্দু আঁতকে উঠে খেয়াল করে, আগুন জ্বেলে রাখার তাড়াহুড়োয় হরষিত প্যান্ডেলের একটা ফেলে রাখা বাঁশকেও অসাবধানবশত আগুনে গুঁজে দিয়েছে! সে কাতর গলায় বলে ওঠে— ''দেখিস, প্যান্ডেলটাকে আস্ত রাখিস!''

পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার...

পুজো যথানিয়মে এগোতে থাকে। ঋষি আর হরষিত টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলোকে লেন্সবন্দী করার কাজটা এগোতে থাকে। এই পূজায় বলি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সৌমেন্দুই বাঙ্গিটোলা থেকে বাইকে চাপিয়ে ঘাতককে নিয়ে আসে। পারিবারিক খড়্গ প্রস্তুত। বলি শুরু হয়—সৌমেন্দু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায়, এই রক্তস্রোত তার স্নায়ুকে ভারাক্রান্ত করে।

ঋষি একটু হালকা রসিকতা করে বলে, ''কি ব্যাপার! তোমার বামপন্থী সংস্কারে বাধছে?'' অন্য সময় হলে একটা তীব্র উত্তর আসতো, কিন্তু সৌমেন্দু কেমন একটা অন্যমনস্ক হয়ে বলে, ''শাহরুখ-অমিতাভের 'মহব্বতেঁ, সিনেমাটা দেখেছিলে? সেখানে কড়া প্রিন্সিপাল অমিতাভ বচ্চনের একটা ডায়ালগ ছিলো— 'পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার' যতোই বিরোধিতা করি না কেন, আমরা এই তিনটের বাইরে বেরোতে পারি না। আমি লেখাপড়া শিখে বামপন্থী চিন্তায় বিশ্বাসী হয়েছি এই সেদিন, কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমার রক্তে বাহিত যে 'পরম্পরা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কার'— তাকে এড়াই কি করে? তাই আমার মৈথিল সংস্কারে এই মাঘিয়া কালীর পূজা জ্বলজ্বল করবেই। বলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গভীরভাবে বিশ্বাস করি আজও, আর রক্তপাত সহ্য করতে পারি না— সেটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।''

ঋষির হঠাৎ মনে পড়ে যায় এম.এ.-র স্পেশাল পেপার রবীন্দ্রনাথের ক্লাস— 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির সংলাপের সেই অসামান্য অংশটা, ব্রাহ্ম সংস্কার পেরিয়ে যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ:

> ''...পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
> আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
> এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
> প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
> চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
> হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
> প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—
> তাহারা কী জীব নহে? রক্তে অক্ষরে

অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—”

‘চণ্ডী’ ও /বনাম ‘কালী’

ঋষি যখন যাদবপুরে পড়তো, অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের ক্লাসগুলি একেবারে ভিতর থেকে গ্রস্ত করে রেখেছিলো তার মতো অনেককেই। স্যারের মুখেই শোনা, আটের দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন তিনি। যাদবপুরে পড়ার সময় যাঁর ক্লাসের খ্যাতি ছিলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও, সেই স্যরকেই সে বলতে শুনেছিলো তাঁর এক শিক্ষকের কথা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তপোব্রতবাবু আক্ষেপ করে বলতেন— আমরা বাংলার ছাত্ররা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্লাস নেওয়ার খ্যাতি শুনি বটে; কিন্তু ননীবাবুর মতো অনেক অধ্যাপক বিস্মৃতির অতলে চলে যান। উল্লেখ্য, এই ননীবাবুর পুত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। কি ছিল তাঁর অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য, যে কারণে তাঁকে আজীবন মনে রাখেন তপোব্রত ঘোষের মতো শিক্ষক? ননীবাবু পড়াতেন মূলত মধ্যযুগের সাহিত্য এবং দেখাতেন তন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যকে কীভাবে পড়া যায়। স্যার বলেছিলেন, সেই ক্লাসগুলি ভোলার নয়।

ঋষি কাজ করতে গিয়ে এক সময় বুঝতে পেরেছিলো, গৌড়বঙ্গে চণ্ডী ও কালীকে খানিকটা সচেতনভাবে, অনেকটাই অসচেতনভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু গবেষক বা গণমাধ্যম— কেউই এই ফারাকগুলো নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখাননি, তাই জনমানসে এই দুই শক্তিদেবীও কোথাও যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন।

মহাসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়কালকে যদি প্রামাণ্য ধরি, তাহলে বাংলায় কালীপূজার সূত্রপাত মোটামুটি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে। কিন্তু লোকদেবী চণ্ডী আছেন একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। দুই দেবী ভিন্ন। তাদের আবাহনমন্ত্রও ভিন্ন। মা কালীর ক্ষেত্রে— “ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং/কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্”...

আর মা চণ্ডীর ক্ষেত্রে— "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বীচ্চে"। ভুললে চলবে না, গৌড়বঙ্গে চণ্ডী এবং কালী— দুই দেবীরই পৃথক অস্তিত্ব আছে। জহরাচণ্ডী, পাতালচণ্ডী বা দেবী দুয়ারবাসিনী চণ্ডীরূপে পূজিতা; কিন্তু মা মনস্কামনা, মুক্তকেশী বা গোবরজনার মা কালী তাঁদের ইতিহাস যেমন বিপুল ও বৈচিত্র্যময়, তেমন পূজাপদ্ধতিও ভিন্ন, সৌমেন্দু সমর্থন করে বলে, সিদ্ধ সাধকের বংশধরেরা পূজা করলেই চণ্ডী আর কালী এক হয়ে যান না। সেন বংশের কুলদেবী ছিলেন চণ্ডী। পালবংশের রাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র রামপাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রামাবতীতে নিজের শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী শাসক লক্ষণ সেন রামাবতী থেকে আরো দক্ষিণে নিজের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। নিজের নামানুসারে এই নোতুন রাজধানীর নাম দেন লক্ষণাবতী বা লখনৌতি। এই রাজধানী-ই পরবর্তী সময়ে গৌড়। এই গৌড়ের নগর দুর্গের চারদিকে চারজন রক্ষার্কর্ত্রী দেবীর চারটি মন্দির বা পীঠ ছিল। তার মধ্যে উত্তরদিকের মাধাইচণ্ডীর পীঠ গঙ্গাগর্ভে বিলীন। পূর্বদিকের জহরাচণ্ডী, পশ্চিমে দুয়ারবাসিনী ও দক্ষিণে পাতালচণ্ডী। সবগুলির প্রতিষ্ঠাকাল মোটামুটি ভাবে ১১৭৯ থেকে ১২০৭ খৃষ্টাব্দ। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ বলে ১৯২০-র প্রথম দিকে লর্ড কার্জনের যে ভারত ভ্রমণের নক্‌শা তৈরী হয়েছিল তাতে গৌড়ের উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে পাতালচণ্ডী বা পাটলচণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

হরষিতও যোগ করে— ঠিক যেমন সব পূজারী ব্রাহ্মণ মৈথিল নন, তেমন নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্য বা কিছু তাড়াহুড়োর গবেষণার সুবিধার্থে এই ভুলগুলো হয়েই চলেছে— সব দোষ সংবাদমাধ্যমকে দিলে চলবে না।

মৈথিল জনসংস্কৃতির সঙ্গে কালীপূজার এক অসামান্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই এই বৈষ্ণব অধ্যুষিত গৌড়বঙ্গে শাক্ত সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন প্রায় চারশো বছর ধরে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

ফিরতি পথ...

কাজ হয়ে যাওয়ার পর হরষিত আর ঋষি সৌমেন্দুকে নিয়ে একফাঁকে ঘুরে আস খাসকোলের পাগলিতলা থেকে। শ্মশানের দিক থেকে ভেসে আসা এক অন্যরকম হাওয়া আর গঙ্গার কনকনে এলোমেলো হাওয়ার কাটাকুটি পেরিয়ে মন্দিরের সামনে হাঁড়িকাঠের সামনে দাঁড়ায় ওরা। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে গ্রিলের জাফরিকাটা আলো মন্দির চত্বরে এক অতিপ্রাকৃত জগৎ তৈরি করেছে। এবার ফিরতে হবে ওদের।

খাসকোল থেকে বেরিয়ে গোবিন্দগঞ্জ হয়ে বাঙ্গিটোলায় ঝা পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে এবার ফেরার পালা। এই শীতের রাতে ফেরাটা বিপজ্জনক— এটা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও পেশার প্রয়োজনে ঋষি আর হরষিতকে ফিরতই হবে। সৌমেন্দু থেকে যায়।

চরাচরব্যাপী কুয়াশা যখন সামনের একহাতের জিনিসকেও দেখতে দিচ্ছে না; মনে হচ্ছে— বাইকের হেডলাইটের আলো কুয়াশা নয়, কোন পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে... এমন অবস্থায় তারা এগোতে থাকে। মাঝে গ্রামের রাস্তা হারিয়ে ফেলার মতো দু-একটা ঘটনাও ঘটেছিলো। সৌমেন্দু রসিকতা করে— "গ্রামের লোক শীতের রাত দুটায় তিনজনকে ধরলে চোরের মার মারবে", হরষিত যোগ করে— "রিপোর্টার জানলে আরো বেশি মারবে"।

মুক্তকেশী মন্দিরের সামনে গাড়ি সামান্য আস্তে হয়। এদের দুজনের মনে পড়ে যায় স্থানীয় বিখ্যাত মিষ্টি বাঙ্গিটোলার ছানার মণ্ডা নিয়ে স্টোরি করার দিনটা। মা মুক্তকেশী এবং এই মিষ্টির মধ্যে একটা নিবিড় সাংস্কৃতিক যোগ আছে, সেটা ওরাই প্রথম দেখিয়েছিলো। দুজনে দুজনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে একটু হাসে। একটা পুরানো ঘটনা— যার কুশীলবও ওরা তিনজনই!

সেদিন মন্দিরে কি একটা পূজা চলছে। সৌমেন্দু টানতে টানতে সদ্য চাকরি বদলানো হরষিতকে মন্দিরের চালে এনে বলে— ''চা, মায়ের কাছ থেকে আজ যা চাওয়ার চেয়ে নে!'' এই বলে নিজেই উচ্চকণ্ঠে বলে— ''মা, মা গো— সামনে পিএইচ ডি-র পরীক্ষা। ভাইভাটা সামলে নেব মা, সে কনফিডেন্স আছে। তুমি শুধু রিটেনটা দেখে নিও।'' ঋষি একটা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করতে থাকে— কিন্তু সৌমেন্দুর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে তাকে সামলানো মুস্কিল। ঋষিও সে চাপ নিতে না পেরে একসময় জোড়হাতে বলে ওঠে— ''দেখো মা, তুমি তো শুধু মৈথিলের মা নও— তুমি সবার মা। কাজেই অমৈথিল হয়ে এই মৈথিলচর্চায় আমার যদি কোন পাপ হয়ে থাকে— মাথায় রেখো সে পাপ আমি একা করিনি। সে পাপ শুচিব্রত সেন করেছেন, ক্যারোল এন ডেভিস করেছেন, বরুণ সাঁই করেছেন, দীপাঞ্জনা শর্মা করেছেন। তাঁরাও আমার মতো অমৈথিল। কাজেই শাস্তি যদি দাও মা— সবাইকে ভাগ করে করে দেবে, কেমন?'' এদিকে হরষিত গ্যাস-অম্বলের সমস্যায় খুব ভুগছিলো। সৌমেন্দুকে ঠেকাতে সে হাতজোড় করে বলে ফেলে, ''মা, গ্যাস কমাও''।

এই গল্পের একটা চূড়ান্ত অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স আছে। হরষিত আজও গ্যাসের ব্যথায় কষ্ট পায়; আর সৌমেন্দুকে গালাগালি দেয়। সৌমেন্দু আবার পাল্টা ঝাঁঝিয়ে বলে, ''মা মুক্তকেশীর কোন দোষ আমি শুনবোই না! তুই গ্যাস কমাতে বলেছিস, মা কমিয়ে দিয়েছে। সারিয়ে দিতে বললে পুরোপুরি সারিয়ে দিতো।''

বিশ্বাস আর আপাত মজাটুকু পেরিয়ে এই মন্দির চত্বর পেরিয়ে রাজ্য সড়কে ওঠে ওরা। পিছনে পড়ে থাকে সেই টিলার উপরের বাড়িটির স্মৃতি, সেখানে ঢুকে ঋষি প্রথম বুঝতে পেরেছিলো 'গামক ঘর' কথাটার আসল মানে কি... সেই একজন লিখেছিলো 'স্মৃতির স্মৃতি'র মতো একটা শব্দবন্ধ। নদীর নামে তার নাম। মুঠোখোলা পেশেন্সের তাসের মতো সামনে অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে বসে থাকে সে। সেগুলোকে সে নিজের মতো করে সাজায়, নিজের মতো করে তাস বাঁটে— চাল দেয়। চাল পছন্দ বলে নিজের মনেই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, চাল পছন্দ না হলে নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়— দাঁত কিড়মিড় করে; কিন্তু কোন চাল ফেরায় না। বাইরের জগতকে ভুলে সে খেলে চলে। ঋষির কানে গমগম করে ওঠে তাদের দুজনের খুব প্রিয় একটা কবিতার স্মৃতি, শক্তির 'আনন্দভৈরবী'— ''সে কি জানিত না যতো বড়ো রাজধানী, ততো বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর/ সে কি জানিত না আমি তাকে যতো জানি, আনখ সমুদ্দুর''।

কাশিমবাজার ও সাতটারি পেরিয়ে পথের শেয়াল আর কুয়াশা বাঁচিয়ে তারা অমৃতি থেকে ডানদিকে শহরের পথ ধরে। শেষ যে মৈথিল গ্রামটি তারা পেরিয়ে এসেছে, তার নাম রথবাড়ি। দূর থেকে মৃদু আলো আর কেঁপে যাওয়া অস্পষ্ট মাইকের শব্দে তারা বুঝতে পারছিলো, সেখানে একটা নয়— একাধিক মাঘিয়া কালীপূজা হচ্ছে।

হায় কিতনে বরস বিতে/তুম ঘর না আয়ে রে...

বিহার ও মিথিলাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মৈথিল বিবাহগীতি যেমন মালদায় এসে অবলুপ্তপ্রায়, তেমনি প্রায় প্রতিটি কালীপূজায় বেজে চলা রামপ্রসাদী বা কমলাকান্তের শাক্তসংগীত আবার ওখানে পাওয়া যাবে না। এইভাবে 'মৈথিল' থেকে 'বাঙালি মৈথিল' হতে গিয়ে সর্বভারতীয় মৈথিল সংস্কৃতির সঙ্গে একটা অসেতুসম্ভব দূরত্ব তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু আবহমানের শাক্ত ঐতিহ্য অমলিন থাকে। তা মিশে যায় উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্যময় আবহমান ধারার সঙ্গে। ফলে পদ্মশ্রী পাওয়া জাতীয় স্তরের মৈথিল বিবাহগীতির শিল্পী শারদা সিনহা এ জেলায় শ্যুটিং-এর অনুমতি পান না, আবার পাশাপাশি লোকসংগীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা হরষিত ঋষিকে একবার দেখিয়ে দিয়েছিলো— জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমায় ব্যবহৃত মৈথিল বিবাহগীতের সুর একেবারেই কোচবিহারের ভাওয়াইয়া আধারিত।

মালদা জেলার মানিকচক, মোথাবাড়ি, রতুয়া ও চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের এককালের সমৃদ্ধ মৈথিলগ্রামগুলি আজ

অনাবাসী বাসিন্দায় পরিপূর্ণ। সারিসারি তালাবন্ধ বাড়ির জঙ্গলে ঘেরা উঠোন, শুকনো তুলসিমঞ্চ আর ধুলোমাখা আসবাব অপেক্ষা করে ছটপূজা, হরিয়ালি তিজ, জিতাষ্টমী বা এমনই কোন মাঘিয়া কালীপূজার। এও তো এক 'ফাইন্ডিং নেভারল্যান্ড' এর গল্প! রথবাড়ি মোড়ে একা দাঁড়িয়ে ঋষি ভাবছিলো... ফ্লাইওভারের উপরে সূর্যটা তখন কোনমতে কুয়াশা ছাড়িয়ে উঠি-উঠি করছে।

"দাদা, তোমার বিনাচিনির চা— ধরো" —হঠাৎ ডাকে চমকে চায়ের গ্লাসটা দুহাতে ধরে সে! গরম ভাপটা নিতে নিতে সে দেখে, ফ্লাইওভারের নিচে আর রাস্তার দুধারে কর্পোরেশনের ফেলে রাখা অতিকায় সিমেন্টের পাইপের পেটে আঁধার কাটিয়ে যে সব মানুষেরা শীতের সকালে পৌঁছলো নিশ্চিন্তে, আর এখন যারা রাশিকৃত ছেঁড়া টায়ারে আগুন ধরিয়ে একটু উষ্ণতার স্পর্শ পেতে চাইছে।

বামদিকে তাকিয়ে ঋষি দেখে— সেই পাগল রিকশাওয়ালাটা না! সারারাত রিকশা নিয়ে রথবাড়িতে বসে থাকে। ইচ্ছে হলে ভাড়া যায়, না হলে যায় না। মাঝেমাঝেই চিৎকার করে উর্দু শায়েরি বলে ওঠে। একঠোঙা মুড়ি আর একটা কাঁচালঙ্কা সামলে আজ তার গলায় উন্মিদ ফাজলির যন্ত্রণা উঠে আসে— "য়ে সর্দরাত য়ে আওয়ারগি য়ে নীঁদ কা বোঝ/হম্ অপনে শহর মে হোতে তো ঘর গয়ে হোতে।" রিক্সাওয়ালার মনে হয় এই কুয়াশার রাতে ভবঘুরের মতো সে ঘুমের তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; একাকী, গৃহহীন।

আর ঋষি হঠাৎ সেই ভবঘুরের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়। ঋষির আরো মনে হয়— সত্যিই, এ তো তার শহর নয়! চোখ বন্ধ করে কলেজ স্ট্রিটের ভোরবেলাকে দেখতে পায় সে। গঙ্গাস্নানের ট্রাম ফিরে গেছে ঘটাং ঘটাং করে, পাঁউরুটির ভ্যানগুলো রওনা দিচ্ছে সারসার, চা দোকানের রাজুদা প্রাণপণে হাওয়া মারছে কয়লা উনুনে—দোকানের সামনে ভিড় বাড়ছে মর্নিং ওয়াকারদের। ভাবে, মালদার গ্রাম আর উত্তর কলকাতা— দুই জায়গাতেই তো থাকলো সে! নাকি কোথাওই থাকলো না ঠিকভাবে! তার তো আবাহন নেই, আবার বিসর্জনও নেই। সকলের থেকে আলাদা বলেই সে একা, নাকি একা বলেই সকলের থেকে আলাদা! কোনটা ঠিক? ঋষির হাসি পায়— নিউজ চিফের বরাদ্দ করা আড়াই হাজার শব্দের ক্ষমতা কি তার সবটা ধরে রাখে? তার কলার টিউনে বেজে ওঠে মিনার রহমান: "আমি তোমার দ্বিধায় বাঁচি/ তোমার দ্বিধায় পুড়ে যাই/এমন দ্বিধার পৃথিবীতে/ তোমাকে চেয়েছি পুরোটাই!"

* এই লেখার উপশিরোনামগুলির জন্য অনুপম রায়-এর গান, অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদানের মন্ত্র, পীযুষ মিশ্র-র কাব্যগীতি, উন্মিদ ফজলি-র কাব্যগীতি, রাজর্ষি দাশভৌমিক-এর কাব্যগ্রন্থ এবং পদ্মশ্রী শারদা সিনহা-র মৈথিল বিবাহগীতের কাছে ঋণী।

*Dr. Rishi Ghosh, Assistant Professor, Department of Bengali, Gour Mahavidyalaya, Malda, West Bengal. is also an Honorary Correspondent at Uttar Banga Sangbad. His area of Researchs: Modern Bengali Poetry; Interdisciplinary Social Studies and Cross-cultural Studies. Contact: rishighosh280283@gmail.com

Thus Spake Nilotpal Roy, A Literary Aficionado

Somnath Bhattacharya*

Abstract

'Pastiche of Angst' (English fiction, published in 2016) and 'Nilotpalnama' (a collection of Bengali nonfictional satire, published in 2019) are two books written by Nilotpal Roy, the bilingual author from modern India. Though it is traditionally accepted that a book-review will furnish itself with the prose and cons of the book(s) concerned but in literature especially, I find, some books are there to mirror the rise and the fall of their authors in the ebb and flow of life. In short, such sui generis books, which are the finest documents of their own authors — witnessing meticulously and documenting carefully the tumultuous journey of a creative mind transforming itself from the chrysalis to imago to a butterfly— must be reviewed as effective critiques placing their authors in the unique bulk of cerebral literature. Now for this kind of books —'Tropic of Cancer' by Henry Miller, 'The Brothers Karamazov' by Fyodor Dostoevsky, 'Ulysses' by James Joyce, 'Wittgenstein's Mistress' by David Markson, 'What the Crow Said' by Robert Kroetsch, 'Master and Margarita' by Mikhail Bulgakov and many more— I feel, knowing their author a bit may prove helpful to the reader to decode the intellectual profundity of the book itself. Pondering on the same, in this creative critique, I have tried to use the author Nilotpal as my magnifying lens to penetrate deep into what he himself calls "Nilotpalisation".

> "Complex, genuinely intellectual, yet dismissive of pretentiousness, self-critical yet tolerant of others, and capable of inspiring deep affection in his friends and admirers".
>
> (Damned to Fame; Preface; James Knowlson)

> "One is still what one is going to cease to be and already what one is going to become. One lives one's death, one dies one's life. One feels oneself to be one's own self and another; the eternal is present in an atom of duration. In the midst of the fullest life, one has a fore-boding that one will merely survive, one is afraid of the future. It is the time of anguish and of heroism, of pleasure and of destruction. An instant is sufficient to destroy, to enjoy, to kill, to be killed, to make one's fortune at the turn of a card."
>
> (Saint Genet; Book-1; Metamorphosis; Jean-Paul Sartre)

INQUEST-KSERA/2384-6813/06

Mr. Knowlson knows well that to talk about Samuel Beckett is to talk about a literary connoisseur who himself wants to be talked about by someone well versed with his works. In 1989, Beckett permits him in his distinguished style of omission — “to biography of me by you it’s yes” — and that must be an elated experience for Knowlson after the years spent arduously by him to author the sole authority of an author, indelibly placed in the cerebral legacy of creative literature. Accordingly, it is to explore Nilotpal Roy — the bilingual author from modern India — and his twenty-three years of unique craftsmanship with English as well as Bengali mediums of writing in Beckettian reverberation, readers must get acquainted with his two latest titles, ‘Pastiche of Angst’ and ‘Nilotpalnama’ (meaning “Nilotpalesque Prose”), the English fiction and the Bengali non- fiction, respectively. Nilotpal the thinker, has a distinctive watermark of expressing things in “onymous subtleties” that even lead the readers to cherish their own delicate being in an imposingly creative way. He documents the basic need for his readers to decipher his “Nilotpalesque aporias” — pervading ‘Pastiche of Angst’ — is to “have a brain within the heart and a heart within the brain” which is possible only through extensive reading, by being regardless of its periphery. His conviction bespeaks that one page of quality writing is an obvious result of hundred-thousand pages of quality reading. Innovative inscription of his own name on the front cover, is not only of an epical grandiose but also thought-provocative enough to identify the author “Nilotpal Roy” as a building on the literose pillars of “heterogeneous equilibrium”. To know the how and what of their assimilating chemistry, you have to be Nilotpalised, as the author claims!

Pastiche of Angst : Delicately Intertwined Delicacies

If you need to have the credibility of such an audacious claim, then you are asked to live the protagonist of ‘Pastiche of Angst’, Nilotpal — must not be confused with the author Nilotpal — who screams at his own existential contingency with a profound knowledge of his own selves, even being schizophrenic. And that is how the challenging sub-title, ‘The Polylithic Analects of a Schizophrenic’, justifies the ‘Authorial Intrusion’ to ask, to touch, to feel, to peel, to lead, to bleed and to reform the readers. To be exact, you are dragged in, to be Nilotpalised and which simply means to live an ostracized, moribund Nilotpal (the character and not the author) who after his break-up with his sensuous fiancée, lives only to become a metamorphic entity, gradually changing into the several other self-same characters from world-literature. Here the author Nilotpal has his exquisite efficacy to let the readers suffer and grow into an insane maturity with the protagonist Nilotpal, as the setting of the plot is his brain only, where the reader as well as the character will have a parallel change from their chrysalis to imago to a butterfly or vice-versa! All through this

mesmerizing maze, the author creates an opportunity to communicate the readers directly to enthrall them by introducing the philosophy of "Death of the Book" ('Pastiche of Angst' being published on 22nd May, 2016) after 49 years of Barthes' "Death of the Author", simply understood as a treatise on the birth of a reader in the cost of the death of an author! Here in this book, the "author" Nilotpal is successful to make the "author" alive to ask, to hint, to lead, to read the readers when and where the need arises:

"AUTHOR AND READER MOVE ALONG THE LADDER
UP AND DOWN, RIGHT AND LEFT, EVERYWHERE THEY BLEED AND SWEAT
TO REACH HELL'S GATE AND FIND THEY'RE ALREADY THERE."

Not only an authorial virility but also a technical uniquity of the author defines this piece as not a book in the truest sense of the word, as in 'Pastiche of Angst' the page numbering starts with zero (0) inscribed on recto and therefore all the versos are odd numbers in lieu of even ones, and once again the author claims this to be something unforeseen in the history of printed books. Here, in a very much Nilotpalesque manner, readers are whipped around their necessary consciousness to decipher this game of recto and verso : "You are staring at the eighth page of this part of this nilotpalisation but the page number of this page is 'vii' and this page is not entirely meaningless." Shunning the beaten track of having chapters and paragraphs, this "Nilotpalesque Genre" has "phases" and "stairs" respectively to let the readers taste the tests of Nilotpal (the author as well as the protagonist) to fail to resist "the Fall".

Though odd enough it is not to say, especially in this era of post-structuralism, that the author Nilotpal is a benevolent hammer, a blessing fire-place, an obdurate will to blacksmith the readers into his own mould but to look deeper into this deconstructive process a new literary movement is flourished, namely "Third Degree Literature" which may simply be understood as a "torturous introspective retrospection". Nilotpal affirms that from the far past to this present there is an obvious unity in the process of becoming what we are, from what we have had planned for ourselves to be, and what we have become in sonorous silence, though no matter how much seemingly discordant this process is but to pattern this metamorphic metempsychosis, we used to feel estranged, even strangulated a bit, may be due to some moral, immoral, ethical, unethical and overall cultural beliefs or barriers, but it is mandatory for a scholar to discover and discuss this centripetal pattern to enrich and to get enriched! More importantly, thus Nilotpal speaks, that this is a torture not only for those who are boastful of their nescience ludicrously, but also for them who are "differently able" or "simply oblivious" to recognise

these ubiquitously outstanding patterns in the process of their own making, and thereby bluntly leaving this ever-renewable mine of knowledge, just misconstruing their own experimental existence, experienced fortunately. Critics opine that 'Pastiche of Angst' is one of the best such patterns defined, because transmogrifications of Nilotpal the protagonist, as well as of the female protagonist, into numerous other entities is proportioned to Nilotpal the author's anagnorisis, with his multilayered individualism. Nilotpal, the author in his prophetic liability, thinks that every unit of moments, memories and manners centring us is crucial enough, to acknowledge ourselves, be it the things that have been considered unintelligibly unimportant, mistakenly done, involuntarily taken place, repulsively exacerbated and debilitatingly dejected must be revisited to squeeze the better us and that is how the modus operandi of "Third Degree Literature" emancipates a reader with psycho- spiritual insights.

Human mind being the kaleidoscopic gyre of emotional intelligence, we need to delve deep into it to tinge ourselves with multocular (not "multicolour") spectrums of it to earn the detached empathy of a true scholar. Like the Cumean Sybil in Pirandello's tone, Nilotpal the author deconstructs "The Triumph of Bullshit" (cf. T. S. Eliot) and meticulously disrobes the scholarly apparel of his readers to let them confront themselves, with their naked shamelessness in an exquisite incompetence to decipher works of Nilotpalesque height even after the omphaloskeptic aid (schema of 'Pastiche of Angst' entitled 'Omphaloskepsis : A Centripetally Centrifugal Gyre') by the concerned authorities. Resonating Nietzsche, "Nilotpalesque Genre" is an abysmal apocalyptica to locate the topsy-turvydom in the minds of his intellectual protégés, phoenixing out, off the Miltonic Dove-like brooding of his stained Id. In a cerebral critique, the kind knife Nilotpal is actually to surgically operate his readers' minds that lack the quality-thinking to assess their own importance of being the critics of creative art. "Third Degree Literature" is not only an imbibing of a processed silence, fumed out of cosmic cacophony, rather a Beckettian monologue it is, to interior the banquet of events resulting in a distinguished salivation of words loaded with emotional glitches. In an authorial eisegesis, "Third Degree Literature" and 'Pastiche of Angst' are the necessary blows on readers' conscience to lead them to light, to enable them to bestow their posterity with the best possible ways of being paragon of creative excellence, and it is just needful in this high time of an intellectual decadence around the globe. Nilotpal the author, helps his readers in self-investigation and hammers with an eternal question that we need to be inquisitive of : "Do I dare? Do I dare to have anything metaphysically invincible to bless my posterity with, which defines me well beyond this vicinity of catering myself tirelessly at the mundane needs and responsibilities?" If not, then we cannot stand at the summit

of 'Pastiche of Angst', especially not being a traditional book but being a roller coaster to reprimand us of that Socratic dictum, "An unexamined life is not worth living." as it lacks the basic quality of living where the least probability of a life even after the physical death is promised. Time and again Nilotpal dictates that if stalwarts like Joyce, Beckett, Markson, Sartre, and Borges would have died only after writing 'Finnegans Wake', 'The Unnameable', 'Wittgenstein's Mistress', 'Being and Nothingness', and 'Labyrinths' respectively, even then they could have had secured the same place where they are today. Hence in accordance with the author Nilotpal Roy it is the creative agility in an unforeseen way that speaks on behalf of an immortality. Nilotpal starts from the scratch to get metamorphosed into a cerebral creature from a mere insect, and the key factors to saturate this reversal of Kafkaesqueness are his adamantine dedication and inhumanly hard-earned abilities to think and to provoke his readers to think poignantly.

Nilotpalnama (Nilotpalesque Prose) : The Essential Nilotpal

Absconding carefully of temporal amusement and emotional clichés, Nilotpal is just scornful of sterile crafts lacking timeless truths to trigger epiphanic illumination; hence he considers very seriously, the impacts of best-selling adumbrations that cataclysmically catalyses his readers' inabilities to "... read also the emptiness in-between the lines as well as the emptiness in-between- in-between the lines", and of course this is the obvious result of an intellectual barrenness swallowing the world. Interestingly enough, here his observation is bipolar. He feels, we have been stiffed at the point of regression not only because of an aversion to quality-labour but because of the lavish indulgence in mediocrity. Nilotpal, the author argues that being mediocre or perfecting mediocrity is merely a choice not to sweat your intellectual entity cherishing the sublime perceptions of mankind, manifesting creative excellence. Regardless of the form, though it may vary from writing, painting, sculpting, filming, or even composing songs, the cathartic attempt must be to aggrandise it at the height of what we understand as "Stendhal Syndrome", resulting at the reeling and draining of one's own consciousness. Creative exuberance and critical fecundity are different extremes of erudition and Nilotpal has sketched these two sublimations as two parallel lines framing the whole of literary activities and complementarily helping each other to be developed in more potent ways. In an intrinsic ensconcement what 'Being and Nothingness' is to 'Nausea', what 'The Sacred Wood' is to 'The Waste Land', and what 'Ecce Homo' is to 'Thus Spake Zarathustra', in the same way 'Nilotpalnama' ('Defecations Sired by the Cerebral Exertion of An Onymous Word-Scavenger') is to 'Pastiche of Angst'. 'Nilotpalnama' (meaning "Nilotpolesque Prose") is a collection of satirical essays in Bengali on the life that Nilotpal lives to love and loves to live. Minutely examining the discriminating

factors of fictional and non- fictional standards of writing, Nilotpal, the author explains that our writings — irrespective of their form — are the stopwatches to hold a certain span of time and the readers must be aided to make their own time in motion, once they start reading the piece. Specifically for non-fiction, to help the readers, the author Nilotpal feels that the approach of writing must be more communicable than the fiction because in writing non-fiction we should depend more and more on analysis, well argued sentences and less on creative experiments. The game of words, language and ideas is expected to be limited and patterned by syllogism only, where the second sentence is supposed to be wombed by the first one; whereas there are ample scopes of creative frenzy in writing a fiction. Nilotpal clarifies that in a fiction there is a story which is already written in the narrator's mind, merely awaiting the word-picturization, but in non-fiction there is an abstract idea to be shaped convincingly; hence this genre of writing is as rare as a natural pearl. To add another feather of rarity, 'Nilotpalnama' is a collection of non-fictional satires, what can easily be classified as an erosive form of witty intellect not to be practised by modern scholars, may be for the uncanny reason of getting habituated with mediocrity that appalls Nilotpal. Eventually, if the satire is an inclination of constructive rectification of follies and foibles to rejuvenate the half-dead, with a club of consciousness, then Nilotpal does this envyingly well in the most challenging contexts of defining human-identity as well as the shifting of identity being human.

Completely negating the potential nonsense of getting identified with the professional attire, when an author asks, "What is your identity? (not the professional one)", then the deafening silence of the interrogated is a matter to work on. Similarly, the sonorous silences of all the following questions are the testimonies of a growing aversion to our truest goal of knowing ourselves ("Gnothi Seauton"). Because if we cannot answer anything about the philosophy of our life, anything about the "what that we are going to bless our posterity with" (certainly except "the habits of eating, sleeping and masturbating"), then Nilotpal's observation for ourselves, being merely the "corpses of anonymous animals" is justified. This deplorable condition is expected to be changed and the expected change must be through the teachers, one of the frontline factors of enlightenment to insist the habit of thinking into next generation. Quoting Marx from his 'Thesis on Fuerbach', Nilotpal vehemently suggests that at least, we the teachers, must not leave any stone unturned to become the Ubermensch of Nietzsche in an Arnoldian manner, as culture needs perspiring cultivation. To ponder over Nilotpal's contribution being an author, an original thinker, and a literary visionary, many more genuine perspectives are still unexplored to be explosively explored by the next enthusiast who must get the necessary rush

from his personal gloss etched on the entrance of his study : "Leave behind your age, degrees, and designations outside the door. Enter with your outstudies, and your outstudies only."

Works Cited

- Knowlson, James. Damned to Fame : The Life of Samuel Beckett. New York : Simon & Schuster, c1996.
- Roy, Nilotpal. Pastiche of Angst. Kolkata : Joyce and Company Publishing Society, 2016
- Roy, Nilotpal. Nilotpalnama. Kolkata : Joyce and Company Publishing Society, 2019

* Somnath Bhattacharya, State Aided College Teacher, Khudiram Bose Central College, Department of English

Encountering the Bifurcated Self and Haunting Memory in Graphic Autobiography: An introspection into the panels of John Lewis's *March: Book One*, illustrated by Nate Powell

Tirtha Sagar Banerjee*

Abstract:

It's a point of contention whether graphic autobiographies are authentic in their depiction of the 'Self' or not. The argument broadens, if an autobiography claims to be a historical and cultural account of a specific time period. After encountering with such questions, this paper picked up John Lewis's *March: Book One*, one of the most celebrated graphic autobiographies of the twenty-first century, to delve into the depth of its panels. Though twenty-first century saw the rise of autobiographical graphic novel as a literary genre, with all its potential, but the academia did not experiment much with its prospective changes and the artistic science behind the word-image clusters. In case of autobiography, it extended the chance of authentic portrayal of the 'I' through verbal-visual panels and thus makes a departure from the traditional form of autobiography. This paper aims to investigate how the autobiographical 'I' divided itself throughout the book and how the authenticity of an autobiographical graphic novel can be judged by its use of clusters, strokes, colours, pictures, speech balloon and gutters. It will also inquire into the subjective self, the memories attached to it, the history, and socio-political current, ran through the whole work.

Keywords: Autobiography, graphic novel, verbal-visual panels, gutters.

In July 30, 2020, a report published in The New York Times informing that on delivering a eulogy at John Lewis's funeral, President Barack Obama saluted Lewis with his speech. The line –"American whose faith was tested again and again to produce a man of pure joy and unbreakable perseverance" shows the immense respect that Obama had for him. Being one of the leading figures participated in the 1960 Nashville sit-in and a civil right activist, John Lewis had to write about the experiences that he faced as an African-American within the United States. With the help of Andrew Aydin and Nate Powell, he took the graphic autobiography as a medium not just to tell but to show the story. As Showing, engages thereader deeply with the narrative flow and involves them in decoding the imprints that the autobiographical 'I' constantly leaving behind. Phillip Lejeune once argued that autobiography is a 'retrospective prose narrative' (Lejeune.p.193) that presents the development of one's personality. This definition might have made Lewis to think about the motion of development and

INQUEST-KSERA/2384-6813/07

the process in which an autobiographical-self manifests itself by maintaining a fusion of personal, relational, racial, socio-economic, cultural and political memories. But as a graphic illustrator, it was a huge challenge for Nate Powell to draw someone else's memories. It is always challenging because usually in an autobiography, the author is always controlling the meaning of the text from behind the text and this 'intentionality' (Anderson.p.2) brings the complex fabric in verbal-visual cluster of the graphic autobiographies. But in *March: Book One*, this intentionality of John Lewis does not always remained constant throughout the narrative flow, rather occasionally it slipped into the silent black holes of affecting memories while rendering the disrespectful, haunting past days. The semi-realistic caricature allowed Nate Powell to give meaning to Lewis's lived experiences through the perceived empirical metaphors that include the culture and shows the assimilation of social experiences, norms and values by the embodied self. This is the reason John Lewis, along with the silences, took the oral mode of narration while controlling the framework of the panels. It gives him the opportunity of what John Murphy said in his *The Voice of Memory: History, Autobiography and Oral Memory*, that oral mode of historical memory 'puts human flesh on the otherwise dry bones of historical argument' (p.159) focusing on the 'empiricist dilemma of objectivity' (p.158).

The speech balloon that illuminates the line - 'DON'T GET WEARY' at the end of his book-one is consciously used to display the continuous challenge for John Lewis throughout his life to be visible to the white Americans. He wanted to be visible, to tell the story of traumatic life by wearing the armour of non-violence, and to earn the identity of a living entity and a life of dignity. The invisibility of the black skinned people to the whites and the attempt of the blacks to be visible to their eyes probably fabricated the whole work through black and white graphic panels. Opening with the violent incident of the Selma to Montgomery march of the civil rights movement, this book unveiled the never expressed pain of John Lewis through clean picturization of the past memory. Using wide angle focal point to start with his story and later breaking them up according to the plot, Lewis, like a master of graphic retelling, segregated his self while encountering with the old traumatic days, days of immense struggle.Surprisingly, Nate Powell's exceptional touch aided the process of this segregation to be organized. While Lewis is confronting with his past to squeeze out the most significant memories, Powell, reordering and retouching them to make it suitable for a graphic autobiography, did not try to intervene with over exaggeration of cartooning. It begins with police officer ordering his force to beat the marching mob on the Edmund Pettus Bridge, a pack of 'niggers'. Sharp strokes, rough sketching aided the intention of the autobiographical self to narrate the story with a jerk. Warning, action,

tear gas, quick movements all are combined to show the unrest and pace of the situation. In the last panel, with just two hands trying to escape the momentum in a longitudinal frame, Nate Powell, sketched the shadow of a policeman, coming closer to the escaping man with his billy club and suddenly all darken. The authorial self acutely designed the story to make it presentable by implementing a frame narrative before introducing the core narrative where he slipped to maintain his grip on past renderings with authorial logocentrism and encounters the blooming of another self who is more real and less authoritative.

The core narrative begins with the 'peaceful transfer of power' in 2009 as Barack Obama became the president of the United States. John Lewis woke up from his bed and gradually getting ready for a meeting to be held in Cannon House Office building. In spite of the cold outside of the Washington DC, the warmth that Lewis felt within reveals how uniquely American day it was. The excitement and joy is depicted through his stubborn facial expression in each panel. The refraining lines - 'You can take my freedom, oh yes! You can take my freedom. But you cannot take my dignity' shows the preparation of telling an account of a man who throughout his life has been dreaming to experience a day like this. Later a black woman, coming from Alabama with his two sons Jacob and Esau, entered the office to meet with their icon congressman John Lewis as he was the embodiment of their historical identity. Lewis greeted them and took them to his personal office room where several photographs are hanged on the wall. But he pointed to only two of them - one is his meeting with president Kennedy when he was twenty three years old and the other is of Dr. Martin Luther King Jr. delivering his famous speech - 'I HAVE A DREAM' taken in August 28, 1963 at the march on Washington. There he himself was one of the speakers talking about the dream of civil rights. But when a boy stops him asking -'Why do you have so many CHICKENS?' Lewis got a chance to share his autobiographical memories by lifting up the storyboard to a new height. Probably he consulted with his illustrator Nate Powell to start with a panel-free wide angleframe, while describing the childhood days in Pike Country, Alabama where his father bought one hundred and ten acres of fields in the spring of 1940 for three hundred dollars. The picturization of a large field beneath the open sky without any enclosure of panel is used to covey the sense of freedom that he was born with. Being a sharecropper, his father had so many animals in his farm but little Lewis always drawn to the chickens.

Another panel-free, mostly dark frame is used here portraying boy Lewis, opening a door of the farm with bright sun rays coming into the dark room, enlightening the defenceless as well as innocent little chickens. Using very few words, the panel is abstained from being just an episodic

memory ‘to provide an accurate account of events to keep track of process in goal attainment’ (Preble, Catherine. 2014.p. 13) but a metaphoric vacuum in silence, to which the real ‘I’ of the autobiographer resides with his/her complexities, emotion, dreams, awkward moments, and innermost feelings. Shklovsky called those silences - ‘mutable complexities of life’ in his ‘Art as Technique’ which enabled the graphic autobiographers to give a ‘pliant representation of the artist’s self’(Mitchell, Adrielle.p.261) through cartooning and caricature. Here, Nate Powell, controlled balancing fragmentation of the self, like a master. A conscientious artist who filled the vacuums with lively images codified with historical, socio- political, ethnical as well as cultural memory beyond figurative elements woven into the caricatured embodiment of the self. The condition of the chickens is so relatable to the black Americans that John Lewis felt so emotionally attached to them. Seeing the parallelism he even gave them individual identity by naming them and meeting them frequently with warmth because ‘no one else could tell those chickens apart, and no one cared to’ (p.23). The panel that draws Big Belle fell down the well, seen through the perception of Big Belle to present the helpless condition like the African-Americans in the United States. His affection toward the chickens, his caring of the eggs, numbering of them with pencil to keep track of their progress, his dream to buy an incubator and his using of a lantern to hatch those eggs display the simplistic lifestyle of Lewis unlike the other American boys. By knowing them personally and naming them because they were each ‘individual’ to him, Lewis, consciously or unconsciously, overlaps the present socio-political turmoil and ‘search for identity’ theme over the fragmented past rendering panels. Nate Powell’s extraordinary handling of the segmentation once again succeeded in the panel where past and present amalgamates because of the liquidity of self, the autobiographical ‘I’. Here the dark portion, covering almost eighty percent of the wide frame, is depicting the caricatured self-dreaming of buying an incubator while at the same time withina small longitudinal white panel, Powell shows the temporary pause that Lewis took because of some interruption where the hand of the interrupter, emerged from the dark background, breaks the shadow line in between past and present.

Lewis’s assimilation of the biblical lines and thinking of himself as a preacher of the holy words shows the aware self of the autobiographical ‘I’ trying to include a sacred book to extend his identity because of what Scott McCloud called ‘constant awareness of self’ (McCloud.p.39) and making it universal. The little yet symbolic panels represent his childish activities through the exaggeration of facial and physical gestures which evokes laughter as well as the psychological pain deep down the surface level of meaning. Whenever the momentum ripped, Lewis altered the outward flow of perception into the inward quest with

silences and facial expression of his semi realistic caricatured self. His realisation of 'the danger of making pets out of farm animals', his emotional bond with the animals 'destined for dinner table'(p.29), delivering of an eulogy in the funeral of the dead chickens, the sense of guilt in applying baptism to the little chicken all are illustrated with very little words and metaphorical silences. The thin panel, that is used to show his first trip to the north in the summer of 1951, only sketched a wheel of the car in motion which served as an icon to serve the notion of change. This metaphoric 'icon' (McCloud.p.27) is used to reflect a crucial change in his life and at the same time a significant spatial shift in the storyboard. Lewis's journey from Alabama to Buffalo through Tennessee and Ohio, his excitement of seeing the city for the first time in his life, his amazement in observing the parallel lives of black and white people in the city, the attractive candy counter and the bag full of 'Neapolitan Candy' completely moved him. While the omnipresent authorial self was giving the description of events like sporadic dots, the real self-hiding behind, cuts his physical embodiment into two separate panels to project the alteration of mindset that he was beginning to inherit. Seeing the habit of the city people and their treatment with the chickens, he himself stopped bothering of chickens which in turn represents the process of gaining maturity and the process of getting the power to cope up with the situation when time and space alter.

The narrative of the omnipresent 'I' suddenly took a turn to be fused with the question of identity and social position. Lewis started bringing in the socio-cultural 'icons' (McCloud.p.27) within his life story. Inspired by the sermon of Dr. King Martin Luther Jr., hetook non-violence as a weapon for resistance. The panels illustrate their hard workshops to train the mind to be non-violent in any kind of situation. This 'dehumanize each other' (p.80) play, needs immense patience and control to endure. The dirt and disgust around this training session is portrayed as if the real seeing-self of the author is re-experiencing those moments. The wretched condition of the 'coloured' areas with poor transportation, broken roads, worn out schoolbooks, hard labour of black prisoners and black peasants all forced Lewis to think about the impact of segregation and the suffering of their people. Here Nate Powell blended the divided autobiographical selves to play with the metaphorical vacuums & icons. By zooming in and zooming out technique he nicely controlled the narrative to be projected like a realistic documentary. In the case of wide angle frames he zoomed out the focus to show the broader aspect of socio-cultural difference with historical and social icons. While the face of thinking, observing and feeling-self with semi-realistic caricature is zoomed in to provide a sense of authenticity to this description.The sense of segregation that a Negro like John Lewis experienced in his life is

drawn through the constant comparison of metaphorical icons. In a chapter called 'The Negro and Recognition' of his famous *Black Skin, White Masks*, Frantz Fanon argues that a Negro is 'constantly preoccupied with self-evaluation and with the ego- ideal. Whenever he comes into contact with someone else, the question of value, of merit, arises'(Fanon.p.211). This self-evaluation machinery is altered in *March:Book One* by projecting their reaction under stress during the training sessions, their technique of protecting themselves, and their maintaining of eye contact with the white attackers. But the significance of this graphic autobiography lies in showing two selves simultaneously while this historical documentation was in process. All these episodic memories are liquefied in the sensitive black holes of life experiences. Along with it, some of the clusters only focused on the eyes of the embodied self to emphasize the irritation, disgust and anger of the less authoritative 'I'. That is why the historicity of this book became so lively with all its depiction of felt experiences. The photographic portrayal of King Martin Luther and Mahatma Gandhi, the humiliation of Rosa Park and the murder of a Negro boy is done with an acute sense of details that the autobiographical 'I' possesses. Lewis did not even hesitate to illustrate the awkward moments, involuntary actions, nervousness and public humiliation that they faced in the course of their protest. In every restaurant the white people rejected serving the 'niggers' and still those 'niggers' kept their cool because of their non-violence idealism. Many people closed their counters on the face of the Negro protesters but they hold their nerve and patience for a broader dream, the dream of getting freedom and a dignified life. By making the panels more widen, showing the collective revolution and breaking the enclosures with the demand of the storyline,Nate Powell shifted the whole autobiographical narrative into a universal texture and tone. This is how an autobiography proved its authenticity through verbal-visual panels or clusters. After observing such a mesmerizing narrative structure, this paper comes to the conclusion that modern autobiography has changed its style of portrayal of the autobiographical self while representing the accounts of socio-cultural truths through telling and showing process. This is why a graphic autobiographical text, like *March:Book One,* deserves academic interest to manifest its artistic possibilities and the question of authenticity it carries with it in contrast with the conventional mode of autobiography.

Work Cited:

- Anderson, Linda. *Autobiography*. Taylor and Francis e-Library, 2001.
- Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. Translated by Charles Lam Markmann, Pulto Press, 1986.

- Lejueune, Phillip. *The Autobiographical Contract*. Cambridge University Press, 1982.
- Lewis, John, Aydin, Andrew and Powell, Nate.*March: Book One*. Top Shelf Productions, 2013.
- McCloud, Scott. *Understanding Comics*. William Morrow Paperbacks, 1994.
- Mitchell, Adrielle. "Distributed identity: networking image fragments in graphic memoirs". Studies in Comics, Vol. 1, No. 2, 2010.
- Murphy, John. "The voice of memory: History, autobiography and oral memory". Historical
- Studies, Vol. 22, No. 87, October 1986.
- Prebble, Sally Catherine. "Autobiographical Memory and Sense of Self". November, 2014. http://researchspace.auckland.ac.nz

- **References:**

- Anderson, Linda. *Autobiography*. Taylor and Francis e-Library, 2001.Brunetti, Ivan. *Cartooning: Philosophy and Practice*. Yale University Press, 2011.
- El Refaie, Elisabeth. "Looking on the Dark and Bright Side: Creative Metaphors of Depression in Two Graphic Memoirs". a|b: Auto|biography Studies Vol. 29, No. 1, March 2014.
- Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. Translated by Charles Lam Markmann, Pulto Press,1986.
- Lejueune, Phillip. *The Autobiographical Contract*. Cambridge University Press, 1982.
- Lewis, John, Aydin, Andrew and Powell, Nate.*March: Book One*. Top Shelf Productions,2013.
- McCloud, Scott. *Understanding Comics*. William Morrow Paperbacks, 1994.
- Mitchell, Adrielle. "Distributed identity: networking image fragments in graphic memoirs". Studies in Comics, Vol. 1, No. 2, 2010.
- Murphy, John. "The voice of memory: History, autobiography and oral memory". Historical
- Studies, Vol. 22, No. 87, October 1986.
- Prebble, Sally Catherine. "Autobiographical Memory and Sense of Self". November, 2014. http://researchspace.auckland.ac.nz
- Sabin, Roger. *Comics, Comix& Graphic Novels: A History of Comic Art*. Phaidon PressLimited, 1996.
- Shklovsky, V. "Art as Technique (1917)", in C. Harrison and P.Wood (eds), Art in
- Theory,1900-2000: An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003.

* Tirtha Sagar Banerjee, Independent Research Scholar

শ্যামাসংগীত ও কালীসংগীত : চেতনার মাঝে অচেনা : একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

দীপাঞ্জনা শর্মা*

হালকা কুয়াশা মোড়া হেমন্তের ভোরে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন এক তরুণ লামা। সুচর্চিত সুঠাম দেহের উর্দ্ধাংশে কালচে লাল চাদর; ডান বাহুমূলের নিচ থেকে ঘুরে বামকাঁধে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে সেটির দুটি প্রান্ত। নিম্নাঙ্গে একই রঙের বস্ত্র। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সূর্যোদয়ের সময় পদ্ম ফুলের প্রস্ফুটন যেন! লাভা শহরের হৃদপিণ্ড লাভা বাজারের অনতিদূরেই লাভা মনাস্ট্রি। সৌধের আয়তন এবং নির্মাণ দেখলে বোঝা যায় পৃষ্ঠপোষণের অভাব নেই! তবে সত্যিই ঘোর লেগে যায় ভিতরে প্রবেশ করলে। সেই অদম্য কৌতূহলের ডানায় ভর করেই ভোরের প্রার্থনাসঙ্গীতে তরুণ লামাটির সঙ্গী হয়ে উপাসনা গৃহে পৌঁছলাম। আমার যোগ্যতা শুধু মাত্র নৈরব্য, তাকেই অবলম্বন করার পর কানে পৌঁছাতে লাগলো কত শত অজানা অচেনা মন্ত্র! ধীরে ধীরে তা যেন গ্রাস করতে লাগলো আমায়, বলা ভালো আমিই সেই মন্ত্রের তন্ত্রে হারিয়ে গেলাম; আর তখনই সামনে খুলে গেল এক অদ্ভুত মায়া সদন। 'না মু মিয়ো হো রেন জে কিও' —এই সাতটি শব্দের দ্বারা সাজানো এক মন্ত্রমালা আন্দোলিত হতে থাকলো প্রার্থনা গৃহের বাতাসে। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল তার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের মিল আছে। গোল চাকতির মতো অংশটি তৈরি হয়েছে চামড়া দিয়ে আর হাতলটি কাঠের। চামড়ার চাকতির চতুর্দিকে সাদা এবং মাঝখানে কালো, অনেকটা তবলার সুর, কানি এবং গাব অঞ্চলের মতো। মধ্যের কালো অংশটিতে আরেকটি সরু কাঠের ছোট লাঠি দিয়ে তাল মিলিয়ে প্রার্থনা চলছিল। প্রার্থনায় যাঁরা বসেছিলেন প্রায় সকলের কাছেই সামনে ওই বাদ্যযন্ত্র রাখা ছিল। প্রার্থনার সময় সেটা তুলে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বাজানোর নিয়ম। প্রার্থনাসংগীতে সুরের থেকে বেশি আকৃষ্ট করে এর ধ্বনিগাম্ভীর্য। প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণে প্রধান লামা মহাশয় শিক্ষকসুলভ তৎপরতায় নবীন ও সদ্যোদীক্ষিত শিষ্যদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন, যাতে এই শব্দগুলি সত্যি সত্যিই মনকে ত্রাণ করার শক্তি অর্থাৎ মন্ত্র রূপে সফল হতে পারে।

বিরাট এবং বিপুলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যে বাসনা সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে মানুষকে উদ্বেল করেছে, তার কারণ; প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ভয়াল রূপ। সূর্য, বৃষ্টি এবং বাতাসকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করতে তাই সৃষ্টি হয়েছিল স্তব-স্তোত্রের। মানুষ নিজেকে নশ্বর জীবনের অধিকারী জেনেও এই নশ্বরতাকে পেরিয়ে শাশ্বত মোক্ষ লাভের আশায় শুরু করেছিলো পূজা-অর্চনা। লৌকিক ও দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে একনিবিষ্ট ধ্যানের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছিল মন্ত্রের। মন্ত্র, অর্থাৎ কিনা যা মনকে ত্রাণ করে; সেই মন যা জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকার ফলে বিপুল বিশ্বের ঐশ্বর্য (ঈশ্বরের ভাব) কে ভুলে যায়! মন্ত্রের দ্বারা সেই অশান্ত চিত্তকে পুনরায় সহজ চিত্তে পরিণত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। যেহেতু প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনাই ঈশ্বরকে তুষ্ট করার অন্যতম পন্থা, তাই প্রকৃতির থেকেই গ্রহণ করা হয় এর উপাদান। মন্ত্রের কথায় যেমন প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মাহাত্ম্য বর্ণনা থাকলো, তেমনি এর সুরে মিশে রইলো প্রকৃতি থেকে আহৃত বিভিন্ন ধ্বনিরসময় উচ্চারণ! সৃষ্টি হলো সাত সুরের– ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ। এদের প্রত্যেকটি কোন না কোন পশু বা পাখির কণ্ঠস্বর থেকে এসেছে। প্রকৃতির আরাধনায় যেন প্রকৃতি নিজেই উপাচার সাজিয়ে দিয়েছেন মানুষের জন্য! সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তার দায়িত্ব প্রকৃতির সকল জীবের প্রতিনিধি হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ভক্তিময় পূজার ডালি তুলে ধরার। বৈদিক সমাজে পূজার্চনা ও যজ্ঞাদির মাহাত্ম্য কারোরই অজানা নয়। সেখানে উপাসনাকালে গোষ্ঠীর সকলে একত্রে উপস্থিত থেকে বন্দনা করতো আরাধ্য দেবতার। সর্বশক্তিমানের কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করে যে

INQUEST-KSERA/2384-6813/08

আশীর্বাদ চাওয়া হতো, সেখানে প্রার্থনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই প্রার্থনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য স্তবস্তুতি ছিল অপরিহার্য। সামবেদে, যেখানে বৈদিক সমাজের পূজার পদ্ধতি ও উপাচার বর্ণিত হয়েছে, তার অপর নাম সামগান। এ থেকেই বোঝা যায় যে স্তব ও স্তুতির মধ্যে সুরের প্রয়োজন কতটা প্রয়োজনীয় ছিলো!

উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে যে প্রবল ভাব-বিহ্বলতা বিষয়টি থাকে, সুরের আন্দোলন তাকে অন্য মাত্রা দান করে। এই কারণেই উপাসকের হৃদয়-সংবেদী গান উপাস্যকে হয়তো স্পর্শ করতে পারে। হয়তো এই কারণেই সংগীত নিজেই সাধনার একটি ধারা হয়ে উঠতে পারে। পূজার প্রথম এবং প্রধান যে শর্ত, অর্থাৎ সমর্পণ এবং নিবেদন, তা বাহ্যিক অন্য কোন উপাচার (অর্থাৎ নৈবেদ্য ও তৎসহ অন্যান্য নিবেদনের দ্রব্যাদি) ছাড়াও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হয়ে ওঠে কেবলমাত্র গানের মাধ্যমে। সাধে কি সাধক বলে ওঠেন—

> "আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা
> শুধু যা জেনেছি সেটুকু হলো এই—
> তোরে ডাকার মত ডাকতে যদি পারি;
> তবে আসবিনে, তোর এমন সাধ্যি নেই!"

এই বিশ্বাস ও এই মনোবল সাধক তথা উপাসকের অন্যতম পুঁজি। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও এই বিশ্বাসের উপর ভর করে সাধক লাভ করে থাকেন সিদ্ধি। আমাদের জনসমাজে এই বিশ্বাসের শিকড় এতটাই সুদৃঢ়প্রোথিত যে আমাদের সিনেমাতেও যেকোনো চরম সমস্যা বা বিপদের মুখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময়েও গানের ব্যবহার অত্যাবশ্যক! শাস্ত্রীয় হোক বা অ-শাস্ত্রীয়; সমস্ত রকম পূজার ক্রিয়াতেই গানের ব্যবহার এভাবেই রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে আমাদের সমাজে। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখবো, মা কালীর পূজার অন্যতম উপাচার হিসেবে শ্যামাসঙ্গীত ও কালীসঙ্গীত কতটা ও কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তন্ত্রের ইতিহাস ও শ্যামা/কালীসংগীতের সঙ্গে তার সম্পর্কও আমাদের আলোচনার অর্ন্তভুক্ত হবে। মন্ত্র যদি মনকে ত্রাণ করার জন্য সৃষ্টি হয় থাকে তাহলে সেই সূত্র অনুযায়ী তন্ত্রের সৃষ্টি অবশ্যই তনু বা দেহকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে। 'তন্ত্রের দেহতত্ত্ব' প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "তন্ত্র বলিতেছেন যে, যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্ম্মিত, উভয়ের মধ্যে একই ভাবে নানা শক্তির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল, সহায়ক হইবে। তুমি ব্যোমযান বা এরোপ্লেন চড়িয়া তাহার সাহায্যে উড়িতে পার; আবার দেহের সাহায্যে খেচরী সিদ্ধি লাভ করিলে তুমি বিনা ব্যোমযান বা এরোপ্লেনে বিমানপথে উড়িয়া যাইতে পার। ...তোমাদের দেহ যদি ঠিকমত প্রস্তুত থাকিত, তাহা হইলে বিনা তারে এবং বিনা স্বতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা বহুদূরে থাকিলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিতে। প্রকৃতির গুপ্ত শক্তিসকলের সহিত দেহের গুপ্ত বা সম্মূঢ় শক্তির কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায়, ইহা যে সাধনার ফলে জানা যায় বা আয়ত্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই তন্ত্র সাধনা।"

এভাবেই তন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ডের মধ্যে সমতা বিধান করতে গিয়ে দেহস্থ বিভিন্ন অঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অংশকে কল্পনা করা হয়েছে। এবং এই কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে সাধক তথা কবিরা আশ্রয় করেছেন রূপককে। যেমনভাবে সর্বশক্তিমান ও মহাশক্তিকে বাস্তবে আকার দিতে গিয়ে মূর্তির অবয়ব তৈরি হয়েছে; তেমনি করেই মন্ত্র ও

গানের মধ্যে রূপকের ব্যবহারে সাধনার গুহ্যসূত্র বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু সাধনাই সাধারণকে অসামান্য করে তোলে, অর্থাৎ অসামান্য শক্তি প্রদান করে, তাই তার পদ্ধতিও সাধারণের থেকে গুপ্ত রাখতে হয় ! স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিশেষ অর্থবোধক গুরুগম্ভীর শব্দের, যেগুলির অর্থ শুধুমাত্র সাধকদেরই বোধ্য। পাশাপাশি এমন কিছু আচার বা ক্রিয়াকলাপও করেন সাধকেরা যত্রা সাধারণ দৃষ্টিতে একই সঙ্গে অদ্ভুত এবং ঘৃণ্য ! সম্যক জ্ঞান না থাকার ফলে যেগুলিকে অজাচার বা অনাচার বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ, যা পরোক্ষে সাধকের সাধনায় সাহায্যই করে থাকে।

অমিতশক্তির অধিকারী বিরাট বিশ্ব প্রকৃতির রূপকল্পে যে আদি দেবতার নাম পাওয়া যায়, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। একই সঙ্গে তিনি কাল বা সময়ের অধিপতি, তাই মহাকাল। 'তন্ত্র' প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেছেন,

> ''কেবল সংহার বা প্রলয়েই যে মহেশ্বরের মহিমা প্রকাশিত, তাহা নহে; সাধকেরা ইঁহাকে শিবস্বরূপ মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করেন। অতি প্রাচীন ঋষি-বচনেও আছে, ''রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং''। এই মহাদেবের মহাশক্তি মহাদেবী বলিয়া পূজিতা। এই মহাদেবীর পূজাই তন্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য।''

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই মহাদেবীই মা কালী ! 'কাল' অর্থে সময়ের ধারণকারিণী শক্তিই হলো কালী। বৃহৎ কালীতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার স্বতন্ত্র পূজার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে প্রথম মহাবিদ্যা কালীকে তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে— কালী, কপালিনী এবং কুল্লা। কালীর পূজায় এই তিন নামে তিনবার আচমন করার বিধি রয়েছে। ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী ইতি চতুর্ভূজা, শবারূঢ়া, মহাভীমা, ঘোরদংষ্ট্রা, শিবা, মুণ্ডমালা-ধরা, ললৎজিহ্বা, দিগম্বরা ও শ্মশানবাসিনী। দেবীর প্রতিষ্ঠা যে চিত্রের উপর কল্পনা করতে হয়, তার বর্ণনা এরূপ— ''একটি অষ্টদল পদ্মের চক্রের মধ্যে একটি বৃত্ত, এবং ঐ বৃত্তের মধ্যে চারিটি ত্রিভুজ; একের পরে অন্যের মধ্যে অঙ্কিত;'' দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারা। তাঁর আসন ''অষ্টদল পদ্মের একটি বৃত্ত, একটি বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ; ঐ ত্রিভূজের মধ্যে ক্রীং লিখিত হয়।'' তারার মূর্তি কল্পনায় বলা হয়েছে ''প্রথম হস্তে পাশ, দ্বিতীয়ে খর্পর, তৃতীয়ে খড়্গ, এবং চতুর্থে ইন্দীবর।'' তৃতীয় এবং চতুর্থ মহাবিদ্যা যথাক্রমে ষোড়শী এবং ভুবনেশ্বরী। এঁদের দুজনের আসনও একটি ত্রিভুজ মাত্র এবং ওই আসন বহুদলযুক্ত পদ্ম। পঞ্চম মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার আসন অষ্টদল পদ্মের মধ্যে একটি বৃত্ত এবং ওই বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ। ষষ্ঠ মহাবিদ্যা ভৈরবীও পদ্মাসনা। সপ্তম মহাবিদ্যা ধূমাবতী ও অষ্টম মহাবিদ্যা বগলা আসন স্থিতা নন। নবম মহাবিদ্যা মাতঙ্গী সিংহাসনস্থা এবং দশম মহাবিদ্যা কমলাত্মিকা পদ্মের উপরে উপবিষ্টা। লক্ষণীয়, অধিকাংশ মহাবিদ্যার রূপকল্পনায় যে অষ্টদল বা বহুদলযুক্ত পদ্মের আসনের কথা বলা হয়েছে, সৌন্দর্য ছাড়াও পদ্ম ফুলের আরেক বিশেষত্বই সম্ভবত দেবীর আসন রূপে এর স্বীকৃতি পাওয়ার কারণ। পদ্মবীজ বহু বছর প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত থেকেও অনুকূল পরিবেশ পাওয়া মাত্রই নবজীবন লাভ করে; অর্থাৎ এর জীবনী শক্তি অসাধারণ এবং একার্থে অলৌকিকও বটে !

শত্রুনাশ ও ধনজনসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি জনগোষ্ঠীর অন্যতম চাহিদা, তা পূরণের প্রার্থনাতেই দেবদেবীর পূজার আয়োজন এবং তাদের রূপকল্পনা তথা আসনসংস্থানে পদ্ম ফুলের ব্যবহার শাশ্বত জিজীবিষাকেই প্রতীকায়িত করে। পদ্মের বিভিন্ন বর্ণ, স্থলে ও জলে উৎপন্ন হওয়ার ক্ষমতা, সর্বোপরি যোজনব্যাপী সুগন্ধ ওই ফুলকে অন্য পাঁচটা ফুলের থেকে আলাদা করেছে। পূজোপাচার হিসাবে নীল পদ্ম বা ইন্দীবরের ব্যবহার তো স্বয়ং রামচন্দ্রের অকালবোধনে পূজার কথা মনে করিয়ে দেয় ! আর্যপুত্র রামচন্দ্রের নীল চোখের সঙ্গে (যা নৃতাত্ত্বিকভাবেও সত্য হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে !) নীল পদ্মের পাপড়ির অভেদ কল্পনা একদিকে যেমন অসাধারণ শিল্প সুষমায় মণ্ডিত তেমনি অন্যদিকে এর পূজোপাচারগত তাৎপর্যও সুকৌশলে

বর্ণিত। আরাধ্য দেবতার আসন যখন এই পদ্মের উপরেই কল্পিত সেখানেই দেখা যায় উপাসক মানস-পূজার সময় নিজের হৃদয়কেই আরাধ্যের আসন হিসেবে উৎসর্গ করছেন। তাই স্তব-স্তুতি, প্রার্থনাসঙ্গীতে হৃদয়কে পদ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফুল মাত্রই সুন্দর, তবু প্রত্যেকটি ফুলের আলাদা আলাদা উপযোগিতা রয়েছে। কোনো ফুল তার রঙের জন্য সমাদৃত, কোনো ফুল বা গন্ধের জন্য, কেউ বা আবার গঠনের জন্য। ফুলের মাধ্যমে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এমনকি সমর্পণ জানানো হয়। পদ্ম বা কমল এক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীটির অন্তর্গত। হিন্দু দেবদেবীর হস্ত কিংবা চরণের রূপকল্পনায় পদ্মের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায় (চরণকমল, পদ্মহস্ত)। চোখের উপমায় পদ্মের পাঁপড়ি (কমললোচন, পদ্মপলাশাক্ষী), অর্ধনিমীলিত চোখের উপমায় পদ্মকুঁড়ি এমনকি দিব্যদৃষ্টি তথা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য সমৃণাল পদ্মকুঁড়ির স্পর্শ করানোর বর্ণণাও পাওয়া যায় বিভিন্ন কাব্যে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নির্দশন চর্যা যে প্রকৃপক্ষে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের গুহ্য সাধনপদ্ধতি, তা আজ সর্বজনবেদ্য। চর্যার পদগুলিতে এই পদ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, অবশ্যই রূপকার্থে। চর্যার দশ সংখ্যক পদে পাই

> ''এক সে পদুমা চৌসঠঠী পাখুড়ী
> তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।''

'চর্যাগীতির ভূমিকা' গ্রন্থে এই পদটির ব্যাখ্যায় লেখক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী জানাচ্ছেন,

> ''সন্ধ্যাভাষার আভিপ্রায়িক অর্থে ডোম্বী=পরিশুদ্ধা অবধূতী বা নৈরাত্মা। তিনি রূপনগরের বাইরে বাস করেন, চপল বটু ব্রাহ্মণ তাঁহার অস্পৃশ্য। তিনি চৌষট্টি দল নির্মাণ-কায়ে নৃত্য করেন।...বিষয়হীন হইয়া বিষয়ভোগ করিবার যোগ্যতা আসিলেই যোগী শূন্যধর্মী ডোম্বীকে লাভ করিতে পারেন। এই ডোম্বীর আর একটি রূপ আছে। অপরিশুদ্ধা ডোম্বী শুক্র নাড়িকায় শুক্রের ধারক, তিনি দেহ-সরোবরের কমল-মৃণাল (শুক্র) ভোজন করেন। কিন্তু স্বরূপে ডোম্বী নৈরাত্ম ধর্ম বা সর্বশূন্যতার প্রতীক। তাহার অভিসঙ্গ করাই যোগীর লক্ষ্য।''

অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছি, চৌষট্টি দল যুক্ত পদ্ম নির্মাণ-কায়ের রূপক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। চর্যার দেহতত্ত্ব অনুযায়ী, এই নির্মাণকায় নাভিতে অবস্থিত; হিন্দু ধর্মে পবিত্র পুষ্পরূপে পরিগণিত পদ্মের উৎস হিসাবে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, বিষ্ণুর নাভিমূল থেকে নির্গত সমৃণাল পদ্মের উপর অবস্থান করেন ব্রহ্মা, যাঁর থেকেই জীবজগতের উৎপত্তি! মনে করতেই পারি, এই পদ্ম হল সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর দেহ-সরোবরের কমল-মৃণাল! পদ্ম যেমন পাঁকে জন্মেও সৌন্দর্য ও নিষ্কলুষতায় জগতকে মোহিত করে; তেমনি সংসারের কলুষতা কাটিয়ে হৃদয়কে পদ্মের মতো পবিত্র ও সৌরভময় করে তুলতে পারলে সেখানেই অবস্থান করেন ঈশ্বর।

চর্যায় দেশনাম হিসেবে 'বঙ্গ', জাতি হিসেবে 'বঙ্গাল' ও নদীনাম হিসেবে 'পঁউয়া' অর্থে পদ্মার নাম পাওয়া যায়। নদীমাতৃক সভ্যতার ধাত্রী ও জীবনস্বরূপা নদীটি পুণ্যতোয়া ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছে দেবপুষ্পের সঙ্গে নামসাদৃশ্যে! আর পদ্মাতীরবর্তী বাংলাদেশের সাধক কবিরা তাঁদের গানে অমর করে রাখেন গভীর ব্যঞ্জনাময় অনুভূতি—

> ''হৃদকমল মঞ্চে দোলে
> করালবদনী শ্যামা
> আমার মনকমল দুলাইছে
> দিবস রজনী, ও মা
> ইড়া পিঙ্গলা নামা

সুষুম্না মনোরমা,

তারই মধ্যে গাঁথা শ্যামা

ব্রহ্ম সনাতনী।"

সাধক রামপ্রসাদের এই গানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উল্লেখ আমাদের যে তন্ত্রচর্চার দিকনির্দেশ করে; তার সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মাচারের মিল পাওয়া যায়। রামপ্রসাদেরই অন্য একটি গানে পাই "গুরুদত্ত গুড় লয়ে মা/প্রবৃত্তি মশালা দিলে/ জ্ঞান-সুঁড়িতে চুবায়ে ভাটি/ পান করে মোর মন-মাতালে"— এই গানটির ক্ষেত্রেও যে গুরুশিষ্য পরম্পরার উল্লেখ রয়েছে এবং মসলা, গুড়, সুঁড়ি, ভাটি ইত্যাদির রূপকে অধ্যাত্ম-চেতনা লাভের কথা বলা হয়েছে তা স্পষ্ট। এই গুরু শিষ্য পরম্পরায় বোধিলাভ চর্যার তন্ত্রচর্চার দিকে ইঙ্গিত করে।

বাক পথাতীত যে সাধন প্রণালী তা সাধারণের কাছে অবোধ্য হলেও যুগে যুগে কবিরা যতটা সম্ভব পার্থিব সাধারণ বস্তুরূপকে তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই চেষ্টারই ফসল রূপে তাঁদের কবিতায়-গানে উঠে এসেছে উপাস্যের অনির্বচনীয় মূর্তি—

"কালো রূপ অনেক আছে

এ বড় আশ্চর্য কালো

যাঁরে হৃদ-মাঝারে রাখলে প'রে

হৃদয়পদ্ম করে আলো"

রামপ্রসাদের এই গানের সমভাব ফুটে ওঠে সাধক কমলাকান্তের ভাবে—

"এই যে দেহ কে বলে মা

অষ্টধাতু দিয়ে গড়া

এ পরানে জানি মাগো

তোমার নামের মন্ত্র ভরা

আনন্দ সায়র মাঝে মা

হৃদ কমলে ভাসো তুমি।"

এ দেহ যেহেতু পঞ্চভূতের আশ্রয়, তাই আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু ভোগ করি সমস্তই ব্রহ্মের কাছে সমর্পিত। বেদমন্ত্রে যেমন রয়েছে—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনাহুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা।।

হরি ওঁ তৎ সৎ"

অস্যার্থ, ব্রহ্মরূপ অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মরূপ হবি সহযোগে ব্রহ্মের নিকট আহুতি সমর্পণ করি। ব্রহ্মই তার গন্তব্য এবং ব্রহ্মেরই কর্ম সে সমাধা করবে। এই উচ্চারণে একই সঙ্গে বিষয় বাসনা ত্যাগ করে বিষয় ভোগের আনন্দ পাওয়া যায়! রামপ্রসাদও এই কথাই সহজ করে বলেন—

"চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়
যত রস এ সংসারে
আহার করো, মনে করো
আহুতি দিই শ্যামা মা রে।"

কখনো বা দৈনন্দিন জীবন জীবিকার বর্ণনার আড়ালে কবি বুঝিয়ে দেন পরম সত্যস্বরূপ—

"শিবের দলিল সই রেখেছি
হৃদয়েতে তুলে তুলে
এবার করব নালিশ নাথের আগে
ডিক্রি লব এক সওয়ালে।"

কিন্তু লক্ষণীয়, রসিক পাঠক শ্রোতার জন্য ভাবের কারবার ঠিক চালিয়ে যান সাধকরা!

"যখন ভবে জমা হোলি
তখন হইতে খরচ গেলি
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে
বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা।"

এই গানের রূপকার্থ হলো— জন্মের পরে ভব অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্ন পার্থিব জিনিস ভোগের ফলে সহজ চিত্তের ক্ষয় হয়; সাধনার দ্বারা পুনরায় সহজচিত্ত ফিরে পেতে দেহস্থ তিনটি কায় বা কেন্দ্রে শূন্যের অনুভূতি জন্মাতে হয়। প্রথম অনুভূতি— শূন্য; তা জন্মায় নাভি বা নির্মাণ কায়ে, দ্বিতীয় অনুভূতি-অতিশূন্য; তা জন্মায় কণ্ঠ বা সম্ভোগকায়ে, তৃতীয় অনুভূতি— মহাশূন্য; তা জন্মায় হৃদয় বা ধর্মকায়ে এবং চতুর্থ ও সর্বশেষ অনুভূতি-সর্বশূন্য; তা জন্মায় উষ্ণীষ বা সহস্রারে! যথাক্রমে গ্রাহ্য বোধলোপ, গ্রাহক বোধলোপ, গ্রাহ্য-গ্রাহক বোধলোপ— এই তিনটিতেই তিনটি শূন্যের অনুভূতি জাগে। শেষটি গ্রাহ্য-গ্রাহক অনুভূতি লোপের যে বোধ সেটিকেও ছাড়িয়ে সর্বশূন্যতার স্তরে পৌঁছয়, যাকে বলে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তি, এবং যা হলো সাধকের চরম লক্ষ্য! জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলনের রূপকও কমলাকান্তের একটি গানে ফুটে উঠেছে এভাবে—

"মজলো আমার মনভ্রমরা
শ্যামাপদ নীল-কমলে
কালীপদ নীল-কমলে
বিষয়- মধু তুচ্ছ হলো যত
কামাদি কুসুম সকলে,
চরণ কালো ভ্রমর কালো
কালোয় কালো মিশে গেল
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত

সঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল।”

শূন্যরূপা মহাশক্তির আরাধনায় ঘুড়ি এবং লাটাই এর প্রতীকেও জ্ঞানের কথা বলেছেন রামপ্রসাদ—

“শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি
ভব-সংসার বাজারের মাঝে
ওই যে আশা বায়ু পরে' ওড়ে
বাঁধা কাটে মায়া দড়ি”

এর সঙ্গে তুলনীয় কমলাকান্তের পদ—

“সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী
আমরা তোমার যন্ত্রে চলি;
যেমন রাখে তেমনি থাকি মা,
যেন বলাও তেমনি বলি।”

শুধু রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তই নন, দাশরথি রায় ও মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক) থেকে শুরু করে অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মায়ের আরাধনা করেছেন গানের মাধ্যমে। সেই মা কখনো বিশ্বরূপা কখনো গর্ভধারিণী মা আবার কখনো বা দেশমাতৃকা। ভক্তির সুবাস হারিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পকেও। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের কবি আলী রাজা, আকবর আলী, নওয়াজিস খাঁ, মির্জা আলী হোসেন-প্রমুখের গানে কবিগানের আসরসংগীত জমে উঠত। শাক্তপদের বন্দনাগীতি 'মালসী' এবং 'শলখা' গান রচনায় এঁদের প্রতিপত্তি ছিল অগাধ। অকুণ্ঠ ভক্তিই ছিল সেই গানগুলির সম্পদ। কিন্তু উনিশ শতকের মুন্সী বেলায়েত হোসেন বা সৈয়দ জাফরের শ্যামাসঙ্গীতে ভক্তিরসের পাশাপাশি অনন্য সুন্দর চিত্রকল্পময় গীতি কবিতার ছবিও দেখতে পাই আমরা—

“হৃদয় মন্দিরে দাঁড়াও
ত্যাজ বাঁশি ধরো অসি
লোলজিহ্বা অট্টহাস
পীত ধড়া ত্যাগ করে
বেড় কটী নরকরে
দৈত্যের মুণ্ড ধরে ঘুচাও ভক্তের মন মসি।” (মুন্সি বেলায়েত হোসেন)

কৃষ্ণ এবং কালীর অভেদ কল্পনা এই গানটির চিত্ররূপ সম্পদ। মা কালীকে বাঁশি অর্থাৎ কৃষ্ণের ভাব ত্যাগ করে অসি ধরতে বলা হয়েছে সঙ্গে লোলজিহ্বা অট্টহাস। কৃষ্ণের বসন পীত অম্বর ত্যাগ করে নরকর অর্থাৎ মানুষের হাতের মালা কোমরে পরতে বলেছেন যা মা কালীর মূর্তিরূপে প্রকাশিত। মায়ের হাতে যে কর্তিত মুণ্ড তা সাধারণ নরের নয়, বরং নরের মধ্যস্থ দৈত্যাংশ; সেটি নাশ করেই ভক্তের মনের মসি অর্থাৎ কালি মুছানোর প্রার্থনা করেছেন কবি। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় কাজী নজরুল ইসলাম (যাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো!) এর একটি গানে কৃষ্ণ অর্থাৎ নারায়ণ অর্থাৎ হরির সঙ্গে হর অর্থাৎ মহাদেবের অভেদ কল্পনার ছবি—

“হে শিব সুন্দর, বাঘছাল পরিহর,

ধর নটবরবেশ, পর নীপমালা।
নব মেঘ চন্দনে ঢাকি অঙ্গ জ্যোতি
প্রিয় হয়ে দেখা দাও ত্রিভুবনপতি
পার্বতী নহি আমি, আমি শ্রীমতী
বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরীধারী।”

হাছন রাজার গানেও এই অভেদ কল্পনা দেখতে পাই জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের রূপায়ণে।

“কত রঙ্গ ভঙ্গ করো
দেখি তোমার নাচানাচি
তুমি ঘরে তুমি বারে
তুমিহী সবার অন্তরে
কে বুঝিতে পারে পরবু তোমার পেছাপেছি
হাসন রাজার এই উক্তি
সকলেই তুই মা শক্তি
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই হৌয়েছি”

সাধক যখন অপার্থিব ভাব-সম্পদে বলীয়ান হন, তখন পার্থিব-লৌকিক ধন সম্পদের প্রতি তার নির্মোহ হওয়াই স্বাভাবিক! আরাধ্য দেবতার কাছে তখন জাগতিক ভোগ সুখ নয়, পারমার্থিক জ্ঞানলাভ ই একমাত্র প্রার্থনা হয়ে ওঠে—

“আমায় কি দিবে ধন
নিজে তোমার নাই বসন
সৈয়দ জাফর তরে কি ধন রেখেছ ধরে
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়” (সৈয়দ জাফর, আসল নাম দরাব আলি খাঁ)

তবে শ্যামাসঙ্গীতের ধারায় ভক্তিরস ও রূপক অলংকার এর অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে লালন ফকিরের গানে। কী নেই সেখানে! সাধনতত্ত্বের গূঢ় অনুভূতির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে এক অলৌকিক ভক্তিভুবন তৈরি করেছেন তিনি—

“এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
সে ফুলে ভাবনগরে
কি শোভা করেছে।
মূল ছাড়া সেই ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড় কৈতব কথা
কে শুনাবে কই তার কাছে।”

এই ফুল সহস্রার পদ্ম ! চারটি রং দেহের চারটি চক্রে শূন্যতার অনুভূতি। এই ফুল সাধারণ নয় তাই তা মূলহীন। ডাল অর্থাৎ শাখা না থাকলেও তার পত্র রয়েছে। লক্ষণীয়, জলে ভাসমান পদ্মের ডাল দৃশ্যমান হয় না কিন্তু পাতা ফুলের পাশেই থাকে !

"কারণ বাড়ির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ওকুল
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সেই ফুলের মধুর আশে।"

এখানে ফুলটি সহজচিত্তের প্রতীক, ভ্রমর বা মৌমাছিটিও সাধারণের মতো কালো নয়; শ্বেতবরণ অর্থাৎ সেটি শুক্রধারক।

"ডুবে দেখ মন দিল দরিয়ায়
যে ফুলে নবির জন্ম হয়
সে ফুল সামান্য ফুল নয়
লালন কয় তার নাই মূল দেশে।"

শেষ স্তবকেই ফুলের রূপকত্ব প্রকাশ করেছেন কবি নিজে। নবি অর্থাৎ হযরতের পবিত্র চিন্তা যেখানে জন্মায় অর্থাৎ সহস্রারই এখানে ফুলরূপে বর্ণিত। এই গানের অনুষঙ্গে অবধারিতভাবে আরেক কালীসাধকের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে— "যত মত তত পথ" !

কালীসাধনা কেবল জাতিগত নয়, দেশগত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিল। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'তন্ত্র' প্রবন্ধে পাই—

> "নীল ও বৃহন্নীল তন্ত্রে 'মহাচীনক্রম' আছে। হিমালয়প্রদেশস্থ জাতি চীনজাতীয় বলিয়া কথিত হইত; এবং এখন যে দেশ চীন বা চায়না নামে খ্যাত, উহার প্রাচীন নাম ছিল মহাচীন। এতৎপ্রসঙ্গে এইটুকু স্মরণে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তন্ত্র শাস্ত্রে 'মহাচীন ক্রম' ও অবলম্বিত হইয়াছিল। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, দেবীপূজায় অবশ্যব্যবহার্য এক শ্রেণীর জবা ফুল, ঐ চীন দেশের আমদানি; এদেশে ছিল না।"

অর্থাৎ বলাই যায়, লাল চিনের লাল পতাকা এদেশে আসার আগেই লাল ফুল চলে এসেছিল ! মজাটুকু বাদ দিলে এই জবা এদেশের জল মাটি বাতাসে এতটা পল্লবিত হয় যে, ভক্ত হৃদয়ের সমস্ত রসটুকু মায়ের পায়ে সমর্পণের অন্যতম নৈবেদ্য হয়ে উঠেছে সে— "তার গন্ধ না থাক, যা আছে সে নয় রে ভুয়ো আভরণ"— চেনা অচেনা বহু শ্যামা সংগীতেও জবার উল্লেখ তাই অনস্বীকার্য।

তান্ত্রিক কালীসাধনার সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মাচারের অনেক জায়গায় মিল পাওয়া যায়। মূর্তিপূজার অংশটুকু বাদ দিলে কালীসাধনায় যে অখণ্ড মহাকালের আরাধনা করা হয় বৌদ্ধ ধর্মেও খণ্ডকাল বা জীবনকে সেই মহাকালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। জাগতিক জীবনের যাবতীয় কষ্ট, শোক, বেদনা জয় করে পুনরায় জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছিলেন; তার সংকলন বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ তথা সূক্তগুলি।

ত্রয়োদশ শতকে নিশিরেন নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, যিনি জাপানের অধিবাসী ছিলেন; তিনি বৌদ্ধ ধর্মসূত্রের পবিত্রতম অংশ 'স্বদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র'র মাহাত্ম্য বর্ণনায় বীজমন্ত্র তৈরি করেন, যা তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা আজও অনুসৃত ! মন্ত্রটি হলো— 'নামু মিয়োহো রেঞ্জেকিয়ো'। জাপানি ভাষার এই মন্ত্রটির অর্থ অনুসন্ধানে গুগল্ জানাচ্ছে—

"In English, they mean"Devotion to the mystic law of Lotus Sutra" or "Glory to

the Dharma of the Lotus Sutra". The words Myoho Renge Kyo refer to the Japanese title of the Lotus Sutra.”

আলোচনার শুরুতেই এই মন্ত্রটির উল্লেখ করেছি আমরা। ভাষা ও উচ্চারণগত প্রভেদকে সরিয়ে রেখে ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই মন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় তন্ত্র তথা কালীসাধনার আত্মিক যোগ রয়েছে। ‘মিয়োহো’ উচ্চারণে মহা এবং ‘রেঞ্জেকিয়ো’ উচ্চারণে রঞ্জক— দুয়ে মিলে মহারঞ্জক অর্থাৎ যা সকলকে রঞ্জিত করে, রাঙায়, বর্ণদান করে। বর্ণ অর্থে জীবন, প্রাণ; যার প্রতীক পদ্মের মতো অনিঃশেষ জীবনীশক্তি সম্পন্ন ফুল অথবা জবার মতো হৃদয়াবেগে রক্তরাঙা ফুল!

লাভায় যে প্রার্থনাসংগীত ভোরকে অনির্বচনীয় করে তুলেছিলো, দার্জিলিংয়ের জাপানিজ টেম্পলে সেই সুরই সন্ধ্যার মেঘমালাকে সাক্ষী রেখে সাধের সাধনায় মনে ভাব জাগালো—

“তুমি আমারই তুমি আমারই
মম অসীম গগনবিহারী”

গানের মন্ত্র আর মন্ত্রের গান এক হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো অদ্বৈত আকাশে। ‘জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে’ যে ‘বন্ধু’ দাঁড়িয়ে থাকেন অসীম কালখণ্ডে, তিনিই তো মহাকালের সঙ্গে আমাদের বন্ধন ঘটান! আমাদের কিছুটা চেনা ‘কালী’ তিনি; অনেকটাই অচেনা!!!

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও তন্ত্রের সেকাল একাল—সম্পাদনা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, খোয়াবনামা, কলকাতা, ২০২১
২. চর্যাগীতির ভূমিকা, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৫
৩. ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৬
৪. Practical Mysticism- Evlyn Underhill, Source-Project Gutenberg

* Dr. Deepanjana Sharma-basically a poet of late 90's Bengali poetry and an awardee of Basudev Dev Samman from Paschim Banga Bangla Academy is a contractual full time lecturer in Malda College, Department of Bengali, P.G. Section. Her area of researches: Temporality in Bengali fiction; Multi Disciplinary studies of Modern Bengali Literature; Field Based research on folk performance in the border regions of Bengal and Jharkhand. Contact: sharmadeepanjana@gmail.com

The Purificatory Ceremonies of Ancient India: The Vedic Genesis

Soumik Piri*

Samskaras were developed to help one achieve one's goals in life by appeasing deities by offering sacrifices and performing rituals. The rituals represent an age when people followed religious injunctions assiduously. Samskaras served as a link between spiritualism and the day-to-day life of the householder. While being an ascetic meant renunciation of all worldly things, Samskaras added spirituality to natural events of a householder and made the householder live a full materialistic life which was however, infused with religious undertones. Because of the disciplinary and Dharmic nature underlying Samskaras, one was guided towards living a life full of right values.

People in the Vedic period were expected to lead a disciplined life with various stages of life classified and Samskaras or sacraments prescribed to be observed at every event in life. A highly evolved ritualistic system guided people to carry out their lives in a systematic manner. The Asrama system described four stages in a person's life, namely, 1.Brahmacarya 2.Grhastaerama 3.Vanaprastaerama and 4.Sanyasa. Brahmacarya was the stage of life from childhood to the end of studies. Grhastasrama was the stage of life when a person got married and led the life of a householder giving birth to and raising children. This was the period when he worked and earned money to satisfy his desires. Vanaprastasrama was the stage when at around the age of 60 years, one began philosophical contemplation. Vanaprasta means that one should go to the forest away from the worries of day to day life to seek spiritual knowledge. Sanyasa is the stage when a person became totally detached from worldly goods and became immersed in his spiritual quest to attain Moksa. The Asrama system reflected the transitional phases of a man from birth, studentship, being a householder, being philosophical and trying to achieve the ultimate, Moksa or deliverance from re-birth. It acknowledged the transient nature of human life with its joys and sorrows and the birth-growth-death cycle. In the Manu Smrti is the following Sloka:

चतुर्थमायुषो भागं वसित्वाद्यं गुरोः कुले ।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ।
वनेषु च वि त्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत्

|| Ma.Sm. iv.1.2.

Having spent the first fourth part of his life in Guru Kula The

second fourth part in his own house with his wife

The third part in the forest

He should take Sanyasa in the final part renouncing all wordly ties

During the four stages of life, one was required to follow the four principles of Purusartha, namely Dharma, Artha, Kama and Moksa. While Dharma or righteousness was to be observed during all the four stages of life, Artha and Kama were to be followed during Grhastasrama. Efforts to attain Moksa were to be made during Sanyasa. Dharma or righteousness was a highly desired concept. Based on the concept of Rta or natural justice, Dharma became a guiding force in all activities of life. Dharma also meant carrying out one's duty judiciously in whatever situation or occupation one was placed in. The combination of righteousness and a sense of duty ensured that justice would be done.

The primary source of Dharma is considered to be the Vedas.

वेदो धर्म मूलम् । तद्वविदां च स्मृतशीले।। || Gau.Dh.S. 1.1.2

Veda is the source of Dharma. And the traditions of those who remember it.

Samskaras or sacraments were developed inspired by the Vedas and the hymns in them. While the Vedas did not contain rules and regulations for conducting rituals, they formed the basis for Samskaras which came into being subsequently. Samskaras specified the way each step in a man's life was to be observed with specific procedures and mantras. The materials required for conducting the rituals, the way to establish the fire and the way to prepare the place where the rituals were to be conducted were clearly spelt out. A householder was expected to follow the rituals or Samskaras depicted in Grhya Sutras, which came to be written by Rsis belonging to the different branches of the four Vedas.

As per Harita Samskaras are classified into two types — Brahma and Daiva.

तथा च हारितः । द्विविधः संस्कारो भवति ब्राह्मो दैवश्च । गर्भधानादिस्मार्तो ब्राह्मः ।
पाकयज्ञहविर्यज्ञसौम्याश्चेति दैवः । ब्रह्मासंस्कारसंस्कृत ऋषीणां समानतां सलोकतां
सायुज्यं गच्छति । दैवेनोत्तरेण संस्कृतो देवानां समानतां सलोकतां सायुज्यं गच्छति । इति ।

|| Hä.Dh.S. Xl.1-5

According to Harita, Samskaras are of two kinds, Brahma and Daiva. Samskaras beginning with Garbhadhana are called Brahma. Paka Yajnas, Havir Yajnas and Soma Yanas are called Daiva. A man who performs Brahma Samskaras attains equality with Rsis and one who performs Daiva Samskaras attains equality with Gods.

Every activity in life was marked by specific Samskaras to be observed. The number and constituents of Samskaras vary according to different Sutrakaras. In the beginning, the number of the Samskaras to be observed by the householder used to be around 48.

According to Gautama, the fortyeight Samskaras include the following:

Garbhadhana, Pumsavana, Simantonnayana, Jatakarma, Namakarana,

Annaprasana, Niskramana, Caula, Upanayana — Eight

Gau.Dh.S.-l.8.14-22

Veda Vratas- Mahanamni, Mahavrata, Upanisadvrata, Godana, - Four Samavartana, Vivaha - Two

Seven Paka Yajnas: l.Astaka 2.Parvana Sthalipaka 3. Sraddha (Pindapitr Yajna) 4. Sravana Karma 5.Agrahayana 6. Caitri 7. Asvayuji (This list varies from source to source. Aupasana and Pratyavarohana are included in some lists instead of Caitri and Asvayuji)

Five Maha Yajnas: l. Deva Yajna 2. Pitr Yajoa 3. Bhuta Yajna 4. Manusya Yajna 5. Brahma Yajna.

Seven Havir Yajnas: I .Agnyadhana 2. Agnihotra 3.Darsapurnamasa

4. Agrayana 5. Caturmasya 6.Nirudhapasubandha 7.Sautramani

Seven Soma Yajnas: l. Agnistoma 2. Atyagnistoma 3. Ukthya

4.Sodasi 5.Vajapeya 6.Atiratra 7.Aptoryama

Eight Atmagunakas: l. Daya: Kindness 2. Ksama: Tolerance 3. Anasuya: Being without jealousy 4. Saucam: Cleanliness 5. Anayasa: Doing things with a balanced mind without over exertion 6. Mangalyam: Concentrating on the good and the auspicious 7. Akarpanyam: Being generous and without greed 8. Aspruha: Having a mind devoid of desires.

Atmagunakas were included because it was felt that merely carrying out

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो बलिरेव च ।
जातकृत्यं नामकर्म निष्क्रमोऽन्नप्राशनं परम् ॥
चौलकर्मोपनयनं तद्व्रतानां चतुष्टयम् ।
स्नानोद्वाहौ चाग्रयणमष्टकाश्च यथायथम् ॥
श्रावण्यामाश्वयुज्यां च मार्गशीर्ष्यां च पार्वणम् ।

उत्सर्गश्चाप्युपाकर्म महायज्ञश्च नित्यशः ।
संस्कारा वियता ह्येते ब्राह्मणस्य विशेषतः

II Quoted in VMS Vol I

Garbhadhana, Pumsavana, Simantonnayana, Visou Bali. Jatakarma, Namakarana, Niskramana, Annaprasana. Caula, Upanayana(10). Vedavratas(4).

Samavartana, Vivaha, Agrayana(3) and Astaka(8).

According to Vyasa, the following are the sixteen Samskaras:

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च ।
नामक्रिया निष्क्रामोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः ।
केशान्तः स्नानोद्वाहो विवाहोऽग्निपरिग्रहः ।
त्रैताग्निसङ्ग्रहश्चैव संस्काराः षोडश स्मृताः ॥

Vy.Sm.-i.13-15

Garbhadhana, Pumsavana, Simantonnayana, Jatakarma, Namakarana, Niskramana, Annaprasana. Caula, Karpavedha, Upanayana, Kesanta, Samavartana, Vivaha, Agni Sacrifices(3) are the 16 Samskaras of the ones who follow Smrtis.

However, the Yajnas, Veda Vratas(except Godana) and Atmagunakas began to be excluded, as time went by, from the list of Samskaras leaving 16 Samskaras . These are known as Sodasa Samskaras. Even in the list of 16 Samskaras, there is difference of opinion among Sutrakaras. Some texts include Visnu Bali, Sosyanti Karma, etc. Karnavedha, Vidyarambha and Vedarambha appear to be later additions.

It is generally accepted that 16 Samskaras are to be observed by a householder. Some of the texts do not include Antyesti which is to be observed at funerals.

1. Garbhadhana- Conception
2. Pumsavana -Ritual for a male child to be born
3. Simantonnayana -Parting of hair of the pregnant wife
4. Jatakarma -Rituals at the time of the child's birth
5. Namakarana -Naming ceremony
6. Niskramana -Ritual when the child is taken out for the first time
7. Annaprasana -Ritual when the child is given solid food for the first time.
8. Cudakarma -Ear piercing-The first hair cut of the child
9. Karnavedha -Teaching of alphabets for the first time
10. Vidyarambha -Ritual of wearing the sacred thread

11.	Upanayana	-Beginning of the study of scriptures
12.	Vedarambha	-
13.	Kesanta (Godana)	-Ritual for shaving the beard for the first time
14.	Samavartana	-Ritual Bath at the end of studentship
15.	Vivaha	-Marriage
16.	Antyesti	-Funeral rites

The first three, namely Garbhadana, Pumsavana and Simantonnayana are considered to be Pre-natal Samskaras. Jatakarma, Namakarana, Niskramana, Annaprasana, Cudakarma and Karnavedha are considered to be Childhood Samskaras. Vidyarambha, Upanayana, Vedarambha, Kesanta and Samavartana are considered to be Educational Samskaras. Vivaha and Antyesti are Samskaras of the householder.

Abbreviations

Ma.Sm.	Manu smṛti
Gau.Dh.S	Gautama Dharma Sūtra
Hā.Dh.S	Hārita Dharma Sūtra
VMS	Vira Mitrodya Saṁaskara Prākasa
Vy.Sm	Vy sa Smṛti

Bibliography

Primary Texts:

- Ṛg Veda Saṁhita
- Goutama Dharma Sūtra
- Hārita Dharma Sūtra

Manu Smṛti Secondary Texts:

1. History of Dharma Sastra Vol I Part I and Vol II Part I, Prof.P.V.Kane BORI, Pune, 1990
2. Hindu Samskaras, Rajbali Pandey Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1969.
3. Ṛg Veda Samhita, Tr.H.H. Wilson & Bhasya by Sayaṇacharya, Ed. & Revised by Ravi Prakash Arya & K.L.Joshi, Parimal Publications, Delhi, 200.1

4. History of Indian Literature, Vol III, Part 2, M.Winternitz, Tr.by Subhadra Jha, Motilal Banarsidass, Delhi, 1967.
5. Gautama Dharma Sutra, Commentary by Haradatta, Vṛtti by Mitakṣara, Hindi Tr. By Dr. Umeshchandra Pāṇḍeya, Chaukhāmbha Sanskrit Samsthan, Vārānasi, 2005.
6. Asvalayana Gṛhya Sutram, Commentary by Narayaṇa, Tr. By Dr.Narendra Nath Sarma, Eastern Book Linkers, Delhi, 1997.
7. Sankhayana Gṛhya Sutra, Bhasya by Narayana, Sankhayana Grhya Samgraha by Vasudeva, Tr. By Dr.Ganga Sagar Rai, Ratna Publications, Varanasi, 1995.
8. Prakasana, Bangalore, 1998 Vivahartha Pradipika (Kannada), Banavati Ramakṛṣṇa Sastri, Banavati

*Soumik Piri is State Aided College Teacher, Kharagpur College, Department of Sanskrit, Kharagpur, West Bengal, India.

জঙ্গলমহালের উলগুলানে গণসঙ্গীত

ড. লক্ষীন্দর পালোই*

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র; পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ইংরাজ সকলে মিলিয়া এক স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবনে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। 'ভারতবাসী কোথায়'?— এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না।" সেই আদি কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে সেখানে ভারতবাসী কোথায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আরণ্যকে এক আদিবাসী রাজকন্যা ভানুমতির চোখে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ট্রাজেডি আবিষ্কার করেছিলেন—

"...আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

... আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

... ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?"

ভানুমতি মাথা নাড়িয়া জানাইল যে কখনও শোনে নাই; কোথাও যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়িয়া, ভারতবর্ষ কোন দিকে? দু-একজন গবেষকের কাজ যেমন জানা তেমনি জানানো, তাই জঙ্গল মহলের ভূমিপুত্র হিসেবে আমাদের কাজ যেমন জঙ্গল মহলকে জানা, তেমনি জানানো। কারণ এখানকার ভূমিপুত্র হিসেবে জঙ্গল মহলের পরিবেশ ও প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার দায়বদ্ধতা অনুভূত হয়েছে। তাই নিজের ইচ্ছা এবং অধ্যাপিকা ড. মহুয়া সরকারের পরামর্শ ক্রমে জঙ্গলমহলকে গবেষণা কর্মে বেছে নেওয়া। জঙ্গলমহলের ভাষা, দুর্গম জায়গা, জঙ্গলের ডাক, জীবন যাপন প্রণালী, আর্থিক ও সামাজিক পটভূমির সাথে আমার আত্মাও যুক্ত। ঘরে ও বাইরে, বিশ্ব বিদালয়ে জঙ্গল মহল নিয়ে নানা প্রশ্ন আমাকে চিন্তিত করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন এসেছেও, জঙ্গল মহল, ঝাড়গ্রাম— মানেই মাওবাদ। প্রশ্নটা ঠিক নয়। জঙ্গল মহল মানেই মাওবাদ নয়। তার অন্তরালে একটা রূপ আছে, একটা পরিবেশ আছে, আছে পর্যটন শিল্প, যে রূপ নিরাভরণ আদিমতা ছোঁয়া, কৃত্রিমতা হীন জঙ্গল মহলের প্রকৃতির রূপ, যেখানে চাঁদ উঠলে এখনো গান উঠে প্রাণে প্রাণে যেখানে কান পাতলে শোনা যায় মাদলের টান। ঝুমুরের সুরে সুরে প্রতিধ্বনিতে নেচে উঠে শাল পেয়ালের বন- যেখানে মহুয়ার টই টম্বুর রসে উদ্মাদনা আনে জঙ্গলবাসীর মনে; যেখানে কোন ঋতুর বৈচিত্র্য খুঁজতে হয়না, জঙ্গলের শোভা, বন, পাতার বাহারই বুঝিয়ে দেয় ঋতুর বৈচিত্র্য। তারা আবিষ্কার করে জঙ্গলের বর্ণে, গন্ধে, ছায়ায় ঋতু বৈচিত্র্যের কথা। দিনে দিনে হাওয়া বদলাচ্ছে সমাজ জুড়ে কৃত্রিমতার ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু জঙ্গল মহল যেন ব্রাত্য। বেলপাহাড়ি, গাডরা সিনি, কুইলা পাল আর সিমলা পাল, ঢুড়ি ঢাউরি, কাঁকড়াঝোড় সেই সাথে খুকা জঙ্গলের আমলাশোলে কিছু আদিমতার ছায়া অতি আধুনিক যুগেও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

না, বললে আক্ষেপ হয় বর্তমানের ঝাঁ চকচকে আধুনিকতার পটভূমিতে বা বিশ্বায়নের যুগে যদি কোন সাহিত্যিক, কথা সাহিত্যিকের মত কোন আদিবাসী রাজকন্যাকে দিয়ে ইতিহাসের ট্রাজেডি খোঁজার চেষ্টা করেন তাহলে দাঁড়ায়—

'...আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

... আমরা জঙ্গল মহল জেলায় বাস করি।

INQUEST-KSERA/2384-6813/10

... ভারতবর্ষের নাম শুনেছে?'

আদিবাসী কন্যা মাথা নেড়ে জানাবে সে শোনে নি; কখনও কোথাও যায় নি। আমলাশোলের পর ভারতবর্ষ কোন দিকে? সত্যি আজকের ইতিহাস থেকে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ দুটো যেন ফুৎকার হয়ে গেছে। বর্তমানে বাস্তব সত্যটা একটা আলাদা হলেও যে ইতিহাস আমরা পড়ি আর মুখস্ত করে পরীক্ষা দিই তা মানব শরীরের কঙ্কাল ব্যাতীত আর কিছু নয় কি?

একটা সময় হৈ হৈ-রৈ রৈ রব উঠেছিল আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার; যেন বানের জলে পলির সঙ্গে জঞ্জাল ভেসে এসেছিল বিস্তর। হর প্রসাদ শাস্ত্রী সেই সময় ঠাট্টা করে লিখেছিলেন— কয়েক বৎসর ধরিয়া জেলার বিবরণ লেখা বাংলার একটি রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। হয়তো রোগের লক্ষণগুলো তাঁর চোখে সঠিক ধরা পড়েছিল। বাস্তবিক ভিত্তিহীন অনুমান, অপ্রামান্য জনশ্রুতি, ইচ্ছাপূরণ কল্পনার রসায়নের সঙ্গে নৈবেদ্যর ওপর কিঞ্চিৎ ফুল বেলপাতা ছিটিয়ে দেওয়ার মত কিছু প্রকাশিত সহকারী গ্রন্থ ও গেজেটইয়ারের উদ্ধৃতি মাত্র সম্বল করে ইতিহাস রচনার প্রয়াসকে রোগ ছাড়া আর কী-ইবা বলা যায়? এসব বইয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্ধ জেলা প্রীতির তাড়ায় নিজের জেলার শ্রেষ্ঠত্বের সগর্ব প্রচার— আর ওই প্রচার যতোই অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের কারো কারো পুস্তকের মধ্যে রাজা জমিদারদের মহাফেজখানার পক্ষপাত দুষ্ট চিঠিপত্র, স্থানীয় প্রবাদ, গ্রাম্য কবিতা, পাঁচালী গান প্রভৃতি উপাদানই মূল্যবান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষ কোথাও কোথাও উপজাতিদের, দলিতদের দলিত হওয়ার ইতিহাস। 'যাদের জীবনটাই -ঝুমুর সম্রাট বিজয় মাহাতোর গানে—

জমিদার বাবু মন আমার ভালোনাই
দুটাকা মদ খেতে দে

কেনইবা নেশা, কেনই বা এমন জীবন যাত্রা, সরেজমিনে দেখা যায় জঙ্গল মহলের মানুষ দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। নেই বস্ত্র, নেই স্বাস্থ্য, নেই আলো, আছে শোক, ভোগ আর যন্ত্রণা। দুবেলা দু মুঠো খাবারের জন্য নির্ভর করতে হয় জঙ্গলের উপর। কারণ যে জমি তারা তৈরি করেছিল সে জমি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে আজ নয়া জমিদারদের হাতে। তাইতো চাকলা কাঠ বিক্রি করে, ঝাঁটি কাঠ, দাঁতন, শালপাতা, শালফুল, মহুল, বাবুই বনমুরগী, গাঁছ পিঁপড়ে বা হেঁড়ে বিক্রি করে দু-বেলা খাবার জোটাতে হয়। অসহায়তার সুযোগ নিয়ে খুদার যন্ত্রণায় উপজাতীর মেয়েরা ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যায়। কেউ বা বন-পার্টিতে[৫] নাম লেখায়।[৫] এখনো বেলপাহাড়ি, আমলাশোল, বাঁশপাহাড়ি, বুলাভেদা প্রভৃতি জায়গার মানুষেরা স্নান সেরে উর্ধ্বাঙ্গের কাপড় শুকনো করে নিম্নাঙ্গে পরে; আবার নিম্নাঙ্গের কাপড় শুকনো করে উর্ধ্বাঙ্গে পরে। এখনো গাছের ডালে বাসা তৈরি করে বসবাস করতে হয়। তাদের ইতিহাস কেমন হবে? তখনই নেমে আসে এক গভীর হাতাশা।

তবুও সেদিন সারা জঙ্গল মহল জুড়ে মাদলের বোল তুলেছিল—

কাটং বাবা কাটং
সাহেব কাটং কাটং
রাঢ়ী কাটং কাটং

মাদলের এই বোলে জঙ্গলমহলের ডাকে জেগে উঠেছিল জঙ্গল মহলবাসী, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল জমিদার জোতদার মহাজনও সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

'জীবন ছড়ানো ছিল মুঠো মুঠো রোদে

ঘাসে ফুলে ঝড়ে জলে
সে দুটি কে নিলো মুছে? তার প্রতিরোধ
কি করছো? যাও বলে'...   (যুবনাশ্ব)

জঙ্গল মহলের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভুমের জঙ্গলাকীর্ণ দুমড়ে যাওয়া পাহাড়, শিলাবন্ধুর অরণ্যনিবিড় পরিবেশ, লালমাটি, পলিমাটির বুকে তৈরি হয়েছে এক ভৌগোলিক সীমান্ত। রাজনৈতিক হিসাব নিকাশে যার একদিকে বিহার অন্যদিকে ছুঁয়ে আছে উড়িষ্যা। আর সংস্কৃতি? এক আদি প্রস্তর যুগের আয়ুধের ব্যবহারে পরিলক্ষিত এক বনেদী আদিবাসী সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতির মধ্যে দেখা যায় ত্রিবেণী সংগ্রামের বৈপ্লবিক দ্যোতনা। যা আমরা দেখতে পাই জঙ্গলমহলের ডাকে কৃষক ও উপজাতি আন্দোলনের মধ্যে। প্রকৃতি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল মানুষ তার জৈবিক তাগিদে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজ, ধর্ম, ধ্যানধারণার মধ্যে গড়ে তুলেছে প্রতিবাদী চিত্র। ঔপনিবেশিক শাসনে জমিদার, জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। রুখে দাঁড়িয়েছে অরণ্যের অধিকারকে রক্ষা করতে। তৈরি করা জমিকে ধরে রাখতে। ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে, সেই সাথে সমাজ অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। যেখানে নূন্যতম বেঁচে থাকার প্রয়োজন মেটাতেই তারা হিমসিম, সেখানে জীবনের হাজার যন্ত্রণা হজম করেও নাচে, গানে, গল্পে যন্ত্রণার ফুল ফুটিয়েছে। তারই কয়েকটি চিত্র নিম্নে আলোচনা করছি।—

চূয়াড় বিদ্রোহের নায়ক, বিষণ সিং-এর স্মৃতিতে একটি গান—

রাজা যাইবে রণ, হাঁসা রাজার ঘোড়া হো।
বিষণ সিং।
রাজা যাইবে রণ ঢাল— তলোয়ার
রাজাকে যুযুয়া যাইবে হাঁসা রাজাক ঘোড়া হো
লড়াইয়ে যাইবেক মর ঢাল— তলোয়ার।
কথি ভিজল হাঁসা রাজার ঘোড়া।
কথি ভজল ঢাল বান হাঁসা রাজাকে ঘোড়া,
কথি ভিজল ঢাল— তলোয়ার।
তারমে ভিজল রণে, হাঁসা রাজার ঘোড়ারে
রকেতে ভিজল ঢাল— তলোয়ার।
কাঁন্দে লাগল খয়রো রানী
নৈয়নে বহে লর
সিঁথাকে সিঁন্দুর রানী
দৈবে তারি লেল।'[১]

অন্যদিকে গ্রাম্য বধূর গাওয়া একটি ঝুমুর গানে পাওয়া যায় নায়েক বিদ্রোহের গান—

হংসা রাজার কাঁসা সিংহ
চড়ল বিষয় সিং (ঝাড়গ্রাম-অচল সিং)
এহো মল ভুঁই এ সাজনে লড়াই
মলভুই এ মারগেল রাজা হো বিষন সিং
পগড়ী আহলরে নিশান যে
পগড়ী দেখে রানী ভাঙে আম ডালগো
পগড়ী লেকে সতী যাব যে
কাঁহা ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
সড়পে ছুটল মর হাঁসা রাজার ঘোড়াগো
রনে ছুটল মর ঢাল তলোয়ার
কৈসে ভিজল মর হাঁসা রাজার ঘোড়াগো
বনে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার
শিশিরে ভিজল মর হাঁসা রাজার ঘোড়াগো
রকতে ভিজল মর ঢাল তলোয়ার।[২]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য অনুযায়ী প্রাকৃতিক কারণে মানভূম জেলাসহ সমস্ত ছোটনাগপুর 'মানভূম এলাকাকে শ্রমিক এলাকা করে রাখার ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার জন্যই এবং বৃটিশ পুঁজি ও তৎকালীন উচ্চবর্ণের জমিদারদের ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সহায়তায়ই চা বাগানের চা উৎপাদন ব্যবসার জন্য সস্তা ও বাধ্যতামূলক শ্রমিকের হাজারে হাজারে প্রয়োজন ছিল। আজও পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, রাঁচী, হাজারীবাগের মানুষের কণ্ঠে এখনও একটি ঝুমুর গান শুনতে পাওয়া যায়—

চল মিনি আসাম যাব
জড়া পাঁখা টানাব
কানের তলে মাছি করে গান
হায় গঙ্গারাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।
সর্দার বলে কাম কাম
বাবু বলে ধরি আন
সাহেব বলে লিব পিঠের চাম

রে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।

কিন্তু এইভাবে সংগঠিত উপায়ে ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে কৃষক উচ্ছেদ কেন ? সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে সস্তা শ্রমিকের বিনিময়ে অনেকবেশী মুনাফাই কাম্য ছিল সেদিন মালিকদের। কিন্তু ছোটনাগপুরেও তো কাজ ছিল। ছোটনাগপুরের লৌহ কয়লা প্রভৃতি খননের জন্য কিন্তু সস্তা শ্রমিক এলো বিলাসপুর, সুন্দরগড়, ছত্রিশগড়, রাইপুর এলাকা থেকে, অন্য দিকে চা বাগানের প্রচুর সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন। কৃষক উচ্ছেদের নব নব প্রথা ও পদ্ধতি, সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, মহামারী তাদের দেশ ছাড়া করল।[৩]

রাজশাহীর নীলকুঠির কিংবা জলাজমি আবাদ করার কাজে এখনও ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ী অঞ্চলের যে গান শুনতে পাওয়া যায়, তারই ক্ষীণ রেশটুকু এখনও এই দেশান্তরী মানুষগুলোর মুখে শুনতে পাওয়া যায়—

শালুক লাড়ার আটার দড়ি
হালে ধরতেই পড়ে মরালী
বাবুর মা বাবুর মা
আজ হামকে ভখেই মরলি
নীল লোঠা ক্যাটে হে
খঁখার বাপ খঁখার বাপ
দেনা টুকু কাঁচা হল্যাদ বাঁটে[৪]

পশ্চিম দিনাজপুরের জামালপুর অঞ্চলে শোনা যায়—

দাদন দেল হপকী সাহেব
দশ টাকা লেন হেঁ
মহাজুনেক বহাল ক্ষেতে
করহি নীল চাষ হে

আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শোনা যায়—

শিখরে আকালে
শিয়াল কুকুর কাঁদেহে
পিয়াল পাকা বাবুর বাপ
দেনা দুটা পিয়াল পাকা প্যাড়েহে

ছোটনাগপুরের শিখর দেশ তাদের স্বপ্নের বিচরণভূমি আদি পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে তারাই একদা পৌঁছেছিলেন ঢাকার কুম্মিটোলাতে কিংবা আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানে। অথবা নদীয়া জেলার সীমান্তে কিংবা সুন্দরবনে।[৫]

ঝাড়খণ্ডী লোকসংগীতে বিপ্লবী প্রতিরোধ দেখা যায়—

ডুংগুরীর উপরে কেরে ঝাঁটে কাটে ?
হামি বটি গো নাগবংশী রাজার বেটা
সরু দাতন কাটি।[৬]

আবার রাজার প্রতি আস্থা নিয়ে ট্যাঁড়গীত—

জায়ুমিলি কেন্দুঝরি
কেন্দুপাচি ছিলা গণ্ডাচারী
মুই সেই কেঁদু লেই
রাজাকু ভেঁটলি।[৭]

এছাড়াও ট্যাঁড়গীত—

ই ডুংরী উ ডুংরী
পিয়া প্যাকছে
বেধুয়া শালা খ্যাল ভরা
হামকে ভের কাছে[৮]

ইতিহাসের নাগবংশী রাজাদের বংশধর মুণ্ডা ও ভূমিজরা জঙ্গলে আর সরু দাতন কাটতে পারছে না। শাল জঙ্গল শেষ হতে চলেছে। কেন্দু পাকা ফল নিয়ে রাজার দরবারে যাওয়ার সরলতা হারিয়ে গেছে কবে। পিয়ালের টকামটা স্বাদ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আদিবাসী ও কৃষকদের জঙ্গলকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। জঙ্গলে নতুন গাছের নতুন আইনের আমদানী করছে বনবিভাগ। ইউক্যালিপটাস আর সোনাঝুরি সরকারী ভাষ্যে সোনার গাছ। পাঁচ বছরের মধ্যে সাইজ করে কেটে খুব সহজেই শহরের কাগজকলগুলিতে পাঠাতে পারা যায়। এক চেটিয়া ধনী ও পুঁজিপতিদের কাছে সোনা এই গাছ। অথচ আদিবাসীদের কাছে এই গাছের কোন মূল্যই নেই। মৌমাছি বসেনা এই গাছে, পাখী বাসা বাঁধে না এই গাছে। পাতাগুলি জ্বালানি শুধু করতে পারা যায়। অথচ শালগাছের শালপাতা, শালধুনো, শাল দাঁতন, শাল ফুল, শাল ফল সবই প্রয়োজনীয় আদিবাসীদের কাছে। তেমনি কেঁন্দু পাতা আর কেন্দু ফুল। পিয়াল মহুয়া, হরিতকী, বহড়া, আমলকী, করঞ্জ, নিম প্রায় শেষ। অথচ দ্রুত বর্দ্ধনশীল ইউক্যালিপটাস জল পেলেই তা বড় হয়ে উঠে। মাটির সামান্য আদ্রতাও তারা শুযে নেয়। ফলে ঘাসও জন্মায় না ঐ গাছের নীচে। তাই জঙ্গলমহলের কবিরা গান বাঁধলেন। সুর দিলেন ঝুমুরের সুরে।

ইউকিলিপিটি গাছ, সেই গাছ মহা গাছ
শুষি লোলা গে ধনী
মাটিকেরী রস, সেতো শুষি লেলা।
আকাশমনি সোনাঝুরি
তর ল্যাগে গড় করি, মরি গেলা

মরি গেলা গে ধনী, ছেড়ি কেরী ঘাস
সেতো মরকি গেলা।
কেঁন্দ, পিয়াল শেষেই ভেল
মহুল, কুসুম কাটি লেল
ফরেস্টারে টাকাই দলান দেলে।
পশুয়াকে নিবেদন, শুন শুন সর্বজন
হামাদের জঙ্গল রাখতে
কাঁড়ে বাঁশে চড়াও হে পাটন
হামাদের শরম রাখতে।[৯]

পুরুলিয়ার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সহ সমগ্র জঙ্গল মহল অঞ্চলে আজও মানুষের কাজ জুটে না। ঔপনিবেশিক আভ্যন্তরীন পুঁজিবাদ তথা প্রচার মাধ্যমগুলির সাঁড়াশী চাপে তারা দিশেহারা। কিন্তু শুধু মাত্র দরিদ্র মেহনতী মানুষের স্বার্থে তারা গাইলেন:

মুলুকে নাহি মিলে কাম, কৈসে বাঁচে প্রাণ,
সাঁঝে খ্যালে বিহানে হয় টান।
পরের ঘরের পর খাটালি, সকাল হলেই
যাই বাগালী রে,
খ্যাটে খ্যাটে পিঠে বহে ঘাম
কৈসে বাঁচে প্রাণ।
আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে
চাষাই করে খঁজা খুঁজি রে
আশ্বিন মাসে বলে ভাইরে
কেহ কারু লহে।
নওয়াগড়ের কুটুম অ্যাল
খাওয়া দাওয়া সরে গেলরে
মাড় ভাতে রাখলেই মান।
যাও ছিল গুঁড়ি-গাঁড়ি
তাও লিল মহাজনেরে
অ্যাড়ে থসে ঝুরত নয়ান।[১০]

একটি ভূমি অর্থাৎ ভাতুয়া (Bonded Labour) মেয়ে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছিলো। সে রাতে দেখতে পায়না, ঢেঁকীই তার কাছে সবচেয়ে কাছের, তার পরনে একটাই ছেঁড়া টেনা অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো। রাঁচী জেলার সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সংগৃহীত একটি গান—

নিছুড়ি নিছুড়ি ডাণ্ডা টুটি
রে ভূমি, কেতিখন দুটি।
বুন দেলও ঝুলুর ধান
ঝাড়তে খামারে বান, রে ভূথি।
ঢেঁকীরে ঢেঁকী ভাচ্যা
আর ভ্যাচা খ্যাটে মরি
ধান সিজা, ধান সুমারে ভূথি।
রোদপানি র‍্যাতকানা
কেমন সুখার টেনা
সবরনেখায় সিনান করিয়ে ভূথি।[১১]

এছাড়াও জঙ্গলমহলের তরুণ কবি ও সুরকার তথা জঙ্গলমহলের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক কৃত্তিবাস কর্মকার যখন তার স্বরচিত ঝুমুর নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান তখন কখন যে হাজার হাজার শ্রোতা তাঁর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে নিজেদের অজান্তেই গলা মেলান সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পুরুলিয়া, বারিপদা, ঝাড়গ্রাম, রাইপুর, দুর্গাপুর, ধানবাদ, রাঁচী, কলকাতা সর্বত্র তাঁর ঝুমুরেই যেন বিপ্লবী প্রতিরোধ।

১
আমাদের ঝাড়খণ্ডের মাটি
চিরজীবন রবে খাঁটি
আত্মদানে দাও অঙ্গীকার
এক সাথে তুলে হাত, করে দিব বাজীমাৎ
জাগাইব ঝাড়খণ্ড সমাজ।

২
(রঙ) এই সোনার ঝাড়খণ্ড আমার যে

(১) এই মাটিতে জন্ম মোদের, আজ যোল জেলা কার?
আগাম দিগাম ভাবে দেখ, সারা ভারতের সারবে

(২)　পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন অ-ভাই এই সীমানা যার

কিছু উড়িষ্যা, কিছু বাংলা কিছুটা বিহারের

৩)　বড়বড় কলকারখানা লক্ষ লক্ষ কোয়াটার

পরদেশীরা চাকরী করে জমিনটা কাহাররে

৪)　অভ্র, তামা, পিতল বিজলী বাতির তার

মাটির ভিতর কাল সোনা হামদের নাই যে অধিকার রে।[১২]

অন্যদিকে তরুণ কবি সুনীল মাহাতো টুসুর গানে লিখলেন—

সাঁওতালডি বিজলী কারখানা
কত বাবুদের আনা গোনা
কলকাতাতে বিজলী যাবেক
পুরুল্যার ট্যাঁড়ে ট্যাঁড়ে
বাতি জলবেক কলকাতাই
আর হামারা রইব আঁধার
এই তো বাবুদের বিচার।

তিনি ঝুমুর গান লিখলেন:

১) বেঙ্গল বলে তুঁই ছুট
বিহার বলে দূর হটো
(রঙ) পুরুল্যা কি ঝাঁপ দিবেক জলে
বাঙআলী ভাই, বিহারী ভাই
দেনটুকু বলে।

২) পাহাড়ে জঙ্গলে খেরা
তাও কেনে সর্বহারা
কারখানায় কারখানা চলে।

৩) খাপরা পিঠা খরাঁই গেল
চিপে চাইপে মরাই দিল
সুনীলে কি পেঁদা কথা বলে।[১৩]

আরও একজন প্রতিভাবান তরুণ কবি ও গায়ক হাজারী রাজোয়াড়। তিনি আরও তীব্র প্রতিবাদে মুখর,

উড়িষাতে লয় উড়িয়া,
পশ্চিমেতে লই পছিয়া
বাংলাতে লয় যদি বাঙ্গালী হে
(রঙ) আমরা কি উপরলে টপকিলি
তরাই সকল বাঁইটে সারে লিলি হে।
হামদের শাল হামদের লড়া
হামদের ভাঙলি দাঁতের গড়া
হাতে টুপা পথে বসাঁই দিহিহে
হামরা কি উপরলে টপকিলি—

এমনিভাবে কবি সদানন্দ মাহাত, বিজয় মাহাত, বিশ্বনাথ মুখার্জী, তারিনী আচার্য, পবন মাহাত, সুখদেব মুণ্ডা, সুগনা পাহান, রঘুনাথ জেরাই, মুকুন্দ নায়েক, সচ্চিদানন্দ লাল, সাহাদেও প্রমুখেরা হাজারে হাজারে গান লিখছেন, সুর দিচ্ছেন,

আর কন্ঠের সুমধুর স্বরে, মাদলের তালে,

যে সমস্ত জঙ্গলমহল গায়ক-গায়িকা ঝাড়খণ্ডের খেটে খাওয়া মনিষের কাছে শহুরে মাধ্যমগুলির নেতিবাচক ভূমিকাকে শিমূল তুলোর মত উড়িয়ে জঙ্গলমহলের লোকসঙ্গীতের প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলছেন, তাঁরা হলেন গোলাপী মাহাতো, কৃত্তিবাস কর্মকার, বিজয় মাহাতো, ধনঞ্জয় মাহাতো, রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জদেও, সুরুপা চক্রবর্তী, প্রদীপ কুমার সিংদেও, বীনাপানী মাহান্ত, অঞ্জলি মাহাতো, হাজারী রকাজোয়াড়, সদানন্দ মাহাতো, পবন মাহাতো, রাম দয়াল মুণ্ডা, অর্জুন হেসা, মদন জেরাই, কর্মবীর মাহাতো, রাখহরি মাহাতো, মঙ্গল সরেন, সামধন পিঙ্গুয়া, কার্তিক সিংমুড়া, দেবযানী বসু, মিনুরানী মাহাতো, সুধারানী মাহাতো, কল্পনা কর্মকার, সহ অন্যান্য অসংখ্য শিল্পী।

প্রতিবাদের গানের মধ্যে যে গানগুলি আজ জঙ্গলমহল অঞ্চলে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলি হলো—

গঙ্গা নও তুমি, কাবেরী নও
কৃষ্ণা নও তুমি, গোদাবরী নও
গঙ্গা দংবাং কানা,
রাজমহল পাহাড়ে, সিধু-কানুর ডাকে
হুল হুল হুল হুল
লক্ষ শহীদের এক নদী রক্ত
অজয়ের বালিতে, দামোদরের পাথরে
সোনা হয়ে ঝরেছে
গঙ্গা দং বাং কানা,

ডোম্বুরী পাহাড়ে, বিরসা মুণ্ডার ডাকে
উলগুনান উলগুনান
লক্ষ শহীদের এক নদী রক্ত
তোমার বালিতে তোমার পাথরে
সোনা হয়ে ঝরেছে—
গঙ্গা দং বাং কানা
শিমলীপাল পাহাড়ে
স্বাধিকারের দাবীতে
সেরাই কেলার দাবীতে
সেরাইকেলার হাটে
স্বপরিচয়ের দাবীতে
বিদ্রোহ, উলগুলান
উলগুলান, হুল হুল
লক্ষ শহীদের এক নদী রক্ত
খরখরীর পাথরে
সোনা হয়ে ঝরেছে।
জগন্নাথ ধল মরেনি,
সিধু কানু মরেনি
বিরসা মরেনি
নির্ম্মল মরেনি,
মহেন্দ্র হেম্ব্রম মরেনি,
মহেন্দ্র হেম্ব্রম মরেনি,
চূনী কোটাল মরেনি।[১৪]

অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কবি বেঞ্জমিন মোলাইজকে ফাঁসী দেবার প্রতিবাদে জঙ্গল মহলের কবিরা গেয়েছেন—

তুমি শুনেছো কি আমাজানের কান্না?
শুনেছো কি মিসিসিপির হাহাকার?
প্রিটোরিয়া আজো কাঁন্দে,
সুবর্ণরেখা আজো কাঁন্দে,

গুমরী গুমরী হায়রে গুমরী গুমরী।
কালো মানুষের রকত লাল,
লাল লাল লালে লাল,
মেকং ভল্গা আজো কাঁন্দে, ব্রহ্মপুত্র আজো কাঁন্দে,
গুমরী গুমরী হায়রে গুমরী গুমরী
শহীদের বলিদান
সেতো নৌতন সূর্য্যের জন্য,
শহীদের আত্মত্যাগ
সেতো নৌতন পৃথিবীর জন্য
বেঞ্জামিন মোলাইজ জিন্দাবাদ
বেঞ্জামিন মোলাইজ জোহার।[১৫]

দক্ষিণ আফ্রিকায় শুধু নয় সমগ্র দলিত মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলাকে কেন্দ্র করে একটি গান সমগ্র জঙ্গলমহল অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছে—

আজের সূরজ ডুবি গেলা
আঁধারতে। ঘেরি লেলাঁঞ
নৌতন সূরজ উঠবেকেই ভই
নেলসন ম্যান্ডেলা তাকর নাম।
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
দলিতের মুক্তি চাই
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
কালো মানুষের মুক্তি চাই।
সেই সুরুজ জেলে রহল
পঁচিশ বছর তরল-গরল
সি-য়া বোথা মুঝি লেরে আজ
নেলসন ম্যান্ডেলা অকর নাম।
জেলের আগুড় নড় বড়
মানুষের কিল বেড়ে ধড়
সয়া লে বোথা বুঝি লেরে আজ

নেলসন ম্যান্ডেলা ঢাকর নামে।
গোষ্ট দাদার ঘরে রে ভাই লগ[১৬]
কেশুভাইয়ের ফাঁসি হইল
রঘুনাথ মাহাত বাঁধাইগেল
বাঁশবনে ডোম হইল কানা
রাগে জ্বইল জঙ্গল মহল থানা।[১৭]

অরণ্যের অধিকার নিয়ে বর্তমানে জঙ্গলমহলে শোনা যায়—

পাত তুলি নিতি নিতি
ঝুড়ি ঝাটি দাঁতন কাটি
আজ কেনে বাবুই করে মানা গো
উয়াদের বন নাই ছিল জানা।

*   *   *

শাল পাতের পাতরি
দোকান বাবুর দরাদরি
লইতন পয়সা নাই জানি গুনাগ।

*   *   *

সরু সরু শাল ঝাঁটি
ভাঙে করি দাঁতন কাঠি
দাঁতন বিকে হয় দুই চার আনা গ।

*   *   *

শাল ঝাটি বিকি কিনি
ঘাম ঝিটা মাড় পানি
তাও কেনে করে জরিমানা গো কি করে বাঁচবে ছানা পুনাগো।[১৮]

এছাড়া শোনা যায়—

বন বাদাড় কাটি কুটি
বাঘ ভালুক ঢাড়াই পিটি
বসমাতায় বানাইল বসত হে
আজসে বসতি পানি ডুবাই দিলরে

হৃদয়ে নির্দয়ে শ্রেঅ

মরদগিনি ঘাটি লুটি

সাঁজ বিহান মাটি কাটি

ক্ষেতে বাড়ি বানাইল সুথর হেঁ

আজ সে ক্ষেতি কারখানা লুটিল রে

*　　*　　*

হামদের গেলি জমি জমা

হামদের চোখে খেদা ধোঁয়া

হামদের ছাওয়া বাগাল ঘাঁটি খায়রে

নকরি বাহারি সব বাহালি ভেলরে।।

জঙ্গলমহলে শোষক ও শোষিতের অনেক গান শোনা যায়—

১) আকাল বছর আইল ঝড়

উড়াইয়া নিল চালের ঘর

ক্ষুদ কুঁড়া ঢুকাইনি গড়রে

মাস পিঠেক হবেক মকরে।।

২) জমিদার বাবু মন আমার ভাল নাই

দুটাকা মদ খেতে দে।।

৩) ধামসা কিনাই দে মাদল কিনাই দে

আর গাউলি এক দুকলি

ঝুমুর শিখায় দে

হামি গাইব বাজাব

মূর্চ্ছা পড়া জীবন টাকে

বেদম পাজাব।

৪) আসছে যাচ্ছে মানুষ গিলা

ভোটের বাজার নোটের খেলারে

ঢেমনা গরুর ঢেমনা ছ্যালা

জলদি যায় বাতিয়ায়

হামকে কি হবেক শিখায়

হামকে কি হবেক বুঝায়
দেশি কুঁকড়ায় বিলাতি
ডাকতে পারবো নাই।
৫) ঝাড়গার হাট থাতে
বাহাইয়া ধরল হাতে
বেহাই ছাড় হাত
ঝুড়ি ঝাটি বিকিয়ে সাঝের ভাত
বিলে ঝাড়ে কাম নাই
সকাল সাঁঝে বহন যাই
পেটের জলায় কাঠি বনের কাঠ
*   *   *
ছুটু ছুটু ছানা পনা
অভাব স্বভাব বুঝেনা
ভকের জালায় কাঁদে সারা রাত
উধার ধারের বালাই নাই
কি করে বাঁচব ভাই
মহাজনে বলে ছোট জাত।[২০]

অবিভক্ত পুরুলিয়ার ভৌগলিক বিস্তার ও নদীর গতিপথ নিয়ে জঙ্গলমহলে শোনা যায়—

১) কাঁসাই শিলাই সুবন্নখা
নাচোই কুঁদোও আঁকাবাঁকা
কুমারী গুয়াই দামোদর গো
ঝাড়খণ্ড কেউসন সুন্দর গো
আওয়া দেখা ভাই
ঝাড়খণ্ড কেইসন সুন্দর গো।।
*   *   *
২) বঙ্গল বলে তুই ছোট
বিহার বলে দূর হটো
বাঙালি ভাই, ও বিহারী ভাই

দেনা টুকু বলে পুরুল্যা

কি ঝাপ দিবেক জলে ?[২১]

জঙ্গল মহলে বীরসা গাথাতেও আদিবাসীদের ক্ষতির বোধ এবং ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে যোগা যোগ পরিস্ফুট হয়েছে—

ও বীরসা আমাদের জমি ভাসন্ত

আমাদের ভেসে গেল

বড় হ্যাট পরা সাহেবরা

আমাদের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে।[২২]

জঙ্গলমহলে সাঁওতাল বিদ্রোহের গান—

১) কেনরে সিদু তুই রক্তে স্নান করলি

কেনরে কানহু ভাই হুল হুল ডাক দিলি

আমার জাত ভাইয়ের জন্যই আমি রক্তে স্নান করেছি

ব্যবসায়ী দেশ লুঠে নিচ্ছে তাই হুল ডেকেছি।

২) প্রিয় জমভূমি ঝাড়খণ্ড দেশ

বিদেশী পীড়নে বিপন্ন আজ

চল চল সরে রনসাজে সাজি

স্বদেশ উদ্ধারে জীবন দিই

দেশের উদ্ধারে জাতীয় মমরে।

আই ভাই প্রাণ ঢালি দিই

জয় মালা পরে কীতির মন্দিরে

পশিয়া সকলে অমর হই

উঠরে উঠরে সাঁওতাল

যে যথা আছিস সাতকূলে ভাই

আবিভোক্তাদের ডাকিছে সমরে

চলরে সকলে ছুটিয়া যাই[২৩]

৩) বীরভূম জিলা ঝিলি মিলি ঘুটুরে জিউয়ি বিন এ সমাকদা

বীর হপন বীর ভূম আরো নিত হঁয় হমর এদা।।

চূয়াড় বিদ্রোহ নিয়ে জঙ্গল মহলে টুসু গান—

১) সিধু কানু চাঁদ ভৈরবে

এহে আমরা করি গৌরবহে
রাঁচি জেলে বীরসা মুন্ডা
ভাঙা রেড়ি ঝন ঝন
লড়কে দিলে হে জীবন
তাইতো হেলে ভগবান
চুনারাম গোবিন্দ স্বত্ব
আর যে কত শত
শিতলার হেম মাহাতরা
মরল বীরের মতসভা লোকের কথাই সব
চূড়ায় লোকের কাণ্ড হে
তাইত চুয়াড় জাগল এবার
জাঁপাতে ব্রহ্মান্ডে হে
সিধু কানু চালে ভৈরবে।।[২৪]
২) টুসুর চানে লাউ ধরেছে
লাউ তুলেছে বাগানে
ওরে বাগলি ধরা পড়ল
লইতন বাজার মহালে
খখন বাগাল ধরা যায় মা
তখন হামরা বাঁধি ঘাটে
ঘাটের হলুদ ঘাটে রহল
টুসু গেলেন দর বারে
উপরে পাটা তলে পাটা
তাই বসেছে দারোগা
ও দারোগা ও দারোগা
সরিয়াই বমো হে
টুসু যাবে কলকাতা
কলকাতা গেলে টুসু
মকরদমায় কি হইল

মকর ডিকরি নিয়ে গো
নীলমনি চালানি গেল।।[২৫]

লোধাদের নিয়ে গান জঙ্গল মহলে দেখা যায়—

কাঠ নিয়ে বাজার গেলে পেটে
পেটে দুটা দানা মেলে
বনে বনে ঘুরি ঘুরি
গেলেক গোটা জাহানটাই বড়াম ঠাকুর সুখ দিলেক নাই
বাঁচার হবিন হি উপাই
ধূলিয়া থাপনা বড়াম
নিঝাঁরি কেঁ ঝারি বড়ামি
নমতম দিয়ে মানসিক করি
আর হু কিবা চাইরে
কেঁদ ভূড়ারু পিয়াল পাকা
আমি দিকে ধোঁকা ধোঁকা
পান আলু চুন আলু
তুগা পাওয়ার দায়রে

কেলিপ টাসের বন হেলেক
লাটা পাটা সিয়ারে গেলে
কেড়িয়া কেয়ের তিতির গুঁড়ুর
সব ডভাড়ি গেলেক হায়রে
গরিবের সুখ পস্তুক ছিলেক
পস্তু দানায় ফুঁরুক হেলেক
বাঁচমু এখন কেমন করি
ভানব সে উপায় রে
বড়াম ঠাকুর সুখ দিলেক নাই।[২৬]

তথ্যসূত্র:

১) রমেশ মাহাত ও দুলাল মাহাত এর ঝুমুর গান, ডারিরি গ্রাম, জলপাইগুড়ি।

২) গোলাপী মাহাত, পলাশবধা, ময়ুরভঞ্জ।

৩) পশুপতি প্রসাদ মাহাত- ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ কলকাতা- ১৯৯৫, পৃ.- ১০৪

৪) ফণীভূষণ মণ্ডলের সংগ্রহে-শিকারপুর, নদীয়া।

৫) পশুপতি প্রসাদ মাহাত-তবৈদ-পৃ. ১০৭।

৬) গোকুলচন্দ্র মুণ্ডা-চাকুলিয়া, সিংভূম

৭) সনাতন পাত্র-রিমিলি, উড়িষ্যা।

৮) রবিলোচন,ভাকুয়াডি-রাঁচী, বিহার।

৯) কর্মবীর মাহাত, জুমিবাত, বালকড়ি, পুরুলিয়া।

১০) পশুপতি প্রসাদ মাহাত, তদৈব, পৃ. ১৫৫।

১১) তদৈব, পৃ. ১৫৬।

১২) তদৈব, পৃ. ১৬৩।

১৩) সুনীল মহাত, পুরুলিয়া।

১৪) পশুপতি প্রসাদ মাহাত, তদৈব, পৃ. ১৬৬।

১৫) তদৈব, পৃ. ১৬৭।

১৬) তদৈব পৃ. ১৬৭।

১৭) পশুপতি প্রসাদ-যাদবপুর সেমিনারে পাঠ্য

১৮) সুশীল মাহাত, পুরুলিয়া।

১৯) তদৈব।

২০) বিজয় মাহাত, ঝাড়গ্রাম।

২১) সুনীল মাহাত-পুরুলিয়া।

২২) গুহ-এলিমেন্টারী আসপেক্ট বীরসার গান-পৃ. ২৮৮

২৩) রনবীর সমাদ্দার-সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৯।

২৪. বিজয় মাহাতো-ঝাড়গ্রাম।

২৫) তদৈব।

২৬) তদৈব।

*Dr. Lakhindar Paloi, Assistant Professor, Department of History, Subarnarekha Mahavidyalaya, Gopiballavpur, Jhargram, West Bengal, India.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে কর্ম,ভক্তি ও জ্ঞানযোগ

মিলন দে*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল জ্ঞানের পরম আধার। এটি যোগ শাস্ত্রও বটে। গীতা কারোর কাছে কিছুই নেয়নি, বরং মানব সমাজকে অনেক দিয়েছে। গীতা পূর্ণ ও স্বয়ংসিদ্ধা। স্বয়ং পুরুষোত্তম পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণীই হলো এই গীতা। তাই গীতার সম্যক ধারণা একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন, অন্যেরা অংশত জানেন। গীতা ব্যাখ্যা করতে বড় বড় পণ্ডিতেরাও বিব্রত বোধ করেন। ভগবদ্গীতা 'কর্ম', 'জ্ঞান', ও 'ভক্তি'-এই তিন যোগের সমাবেশ। মানুষের জীবনও তিনটি স্তম্ভে বিভক্ত-'কর্ম', 'জ্ঞান', ও 'ভক্তি'। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বিষয়কে আত্মস্থ করে যথাযথভাবে জীবনের পাথেয় করতে পারেন, তিনিই একমাত্র সাধারণ মানুষ থেকে দেবত্বে উন্নীত হতে সক্ষম হন।

'যাগ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত 'যুজ' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'ঐক্যবদ্ধ করা', 'নিয়ন্ত্রণ করা', বা 'যুক্তকরা'। খুব সম্ভবত 'যুজির্সমাধৌ' শব্দটি থেকে 'যোগ' শব্দটি এসেছে। আর এর অর্থ 'চিন্তণ'। যোগ হল ব্যক্তি সত্তার সাথে বিশ্বসত্তার মিলন। যোগ অনুশীলনকারী বা দক্ষতার সাথে উচ্চমার্গের যোগ দর্শন অনুসরণ করেন যিনি, তিনিই হলেন 'যোগী' বা 'যোগিনী'। যোগ শাস্ত্রের অন্তর্গত কর্মযোগ নির্মল আনন্দময় কর্মের পথ, জ্ঞান যোগ হল জ্ঞানের পথ এবং ভক্তিযোগ পরম শান্তিময় ভক্তির পথ।

কর্মযোগ- কর্মশিক্ষা ও কর্মপ্রেরণাই গীতার একটি বিশেষত্ব। প্রাচীণ ভারত কর্মবলেই শ্রেষ্ট হয়েছিল। শৌর্য-বীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখ-সমৃদ্ধিও শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। গীতার কর্মযোগের মূল বিষয়বস্তুই হল নিরভিমানিতা এবং অহংত্যাগ, আর তার দ্বারাই সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হয়। গীতোক্ত কর্মযোগী সাত্ত্বিক কর্তা, যিনি, নিষ্কাম, সম শান্ত, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ,[১] আসলে এই কর্মযোগ মোক্ষ সেতু। তাই গীতার আদ্যোপান্তই কর্মের প্রেরণা, যুদ্ধের প্রেরণা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'মামনুস্বর যুধ্য চ '[২], আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'-যা গীতোক্ত কর্মযোগের মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কর 'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'[৩]। এই কারনে কর্মযোগী নিস্পৃহ থেকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে যথাযথ কর্ম করতে পারেন।

"That which the Gita teaches is not a human but a divine action– Not the performance of social duties but abandonment of all other standard of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature.

…………… In other words the Gita is not a book of practical ethies but of spiritual life.[৪]

Essays of the Gita

Sri Aurobinda

জ্ঞানযোগ- গীতার মূখ্য উদ্দেশ্য হল পরমাত্মা লাভ। অনাদিকাল থেকে অজ্ঞানতাবশতঃ প্রাণীগন সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত। তাদের উদ্ধার লাভের জন্যই জ্ঞানযোগের অবতারনা। তাই গীতার অনেক স্থানেই ব্রহ্মভাব, ব্রাহ্মস্থিতী, সাম্যবুদ্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাব লাভ হলে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি জন্মায় । ব্রহ্ম বলতে যা বোঝায় তা হল সর্ববৃহৎ বা সর্বব্যাপী। যিনি সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন। যাঁর সত্ত্বায় সমস্ত সত্ত্বাবান সেই অদ্বিতীয় নিত্যবস্তুকেই 'ব্রহ্ম' বলে।

INQUEST-KSERA/2384-6813/11

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে-

১) সমস্ত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয়।

২) বহুত্বের মধ্যে একাত্ম দর্শন হয়[৫]।

৩) প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়[৬]। ইত্যাদি

এই ব্রহ্ম নিত্য, নির্গুন-গুনী, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরেরই নির্গুন নির্ভর[৭]। গীতা ও ভাগবতে জ্ঞানীকেই 'শ্রেষ্ঠ ভক্ত' ও ভাগবোত্তম বলা হয়েছে[৮]।

ভক্তিযোগ- গীতার বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিশেষ করে সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তিমার্গে পরিপূর্ণ। ভগবান ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়েছেন। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেছেন, ভক্তির দ্বারাই ভগবৎ কৃপায় জ্ঞান হয়। জ্ঞানই মোক্ষ, তাই ভক্তি মোক্ষ দায়ক। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন আমার মায়া সুদুস্তরা। যে তোমাকে আশ্রয় করে, সেই কেবল এই মায়া কে অতিক্রম করতে পারে[৯]। শুধু তাই নয়, তিনি প্রিয় অর্জুনকেও বলেছেন, 'তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব[১০]। উত্তরে অর্জুন বলেছেন পরমউৎকৃষ্ট ভগবৎ শরনাবতি-আমি তোমারই, তুমি আমার একমাত্র গতি, প্রভু রক্ষা কর'। এটি গীতার শেষ উপদেশ।

ভক্তিমার্গের আর একটি উচ্চতর ভাগ হলো 'তুমি আমার', প্রেম ভক্তি ও ব্রজের ভাব। বিশুদ্ধ প্রেম কেবলমাত্র রসাস্বাদন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে-এই রসের পূর্ণতায় 'আমিই তুমি' এই ভাব উপস্থিত হয়। তখন কেবল 'আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ'-কৃষ্ণ অহং ইতি চাপরা[১১] এমন মনে হয়।

চাপরা[১২] ইহাই ভক্তি শাস্ত্রের অধিরঢ়ভাব। বেদান্তের 'সোহহ্ম জ্ঞান', পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন। এখানেই বেদান্ত ও ভাগবত এক হয়ে যায়। পূর্ণ ব্রহ্ম লীলার ছলে কখনো রাধা হন, কখনো বা কৃষ্ণ। তাই 'রাধা-কৃষ্ণ' তত্তম অতি দুরূহ বিষয়। যুগলে মিলিত হয়ে পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

শ্রীমৎভাগবত গীতা হল জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয়। এই তিনশক্তির মিলনে যুগধর্মের অবতারণা। এখানেই গীতার স্বার্থকর্তা। বহু বিদ্বগ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিতে গীতাকে দেখেন এবং বলেন, গীতা-কর্মযোগশাস্ত্র, গীতা ভক্তিযোগশাস্ত্র, গীতা ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখে, 'মদ্ভাবমাগতা' 'মমসাধর্ম্যআগতা' ইত্যাদি শব্দগুলি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন সকল জীব সাধনাবলে যেন অন্তিমে তাঁর চরনযুগলে আশ্রয় নেয়। যা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেও অনন্ত।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাব কি ?-তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ তিনি চান তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপ হোক। সচ্চিদানন্দ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'সৎ' 'চিৎ' এবং 'আনন্দ', অর্থাৎ সন্ধিনী, অর্থাৎ সন্দিনী, সংবিৎ ও হল্লাদিনী শক্তি। শক্তির প্রকাশ ক্রিশতে, যেমন সূর্যের প্রকাশ কিরণে, অগ্নির প্রকাশ দহনে, ঠিক সেই রকম সৎ ভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে সন্ধিনী। চিৎভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে সংবিদ এবং আনন্দভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে হল্লাদিনী।

জীবতত্তম বুঝতে হলে আগে জানতে হবে সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তিকে। কারন পূর্নব্রহ্মের অংশ হল জীব। অর্থাৎ চিৎকনা বা ব্রহ্মকণা ব্রহ্ম। অগ্নিরই স্ফুলিঙ্গ। ব্রহ্মের মধ্যে ভাব ও শক্তি পূর্নভাবে প্রকাশিত। কিন্তু চিৎকনা বা ব্রহ্মকনার মধ্যে সেই ভাব বা শক্তি সুপ্ত ভাবে থাকে। তাই বলা যেতে পারে জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তা। জীবের যে তিনটি শক্তি

তা ব্রহ্মশক্তির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু প্রকাশে। পূর্ণব্রহ্মের ক্ষেত্রে তা প্রস্ফুটিত। আর জীবের ক্ষেত্রে তা প্রকাশের অপেক্ষায়। জীবের মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি তা উচ্চতম গ্রামে সংবিৎ যার ফল প্রজ্ঞা এবং জীবের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি তা উচ্চশক্তি তা উচ্চতম গ্রামে হল্লাদিনী, যার ফল প্রেম। জীবের এই অন্তঃনিহিত শক্তি সাধনের তিনটি পথই হল-কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই প্রসঙ্গে বেদান্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

'শ্রীভগবান উচ্চচূড়ায় আরুঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জীব কে সচ্চিদানন্দে পূর্ণবিকশিত হইতে হইলে এই মার্গ কে সম্পূর্ণ রুপে আয়ত্ত করিতে হয়। এই জন্য গীতায় দেখি কর্মবাদ, জ্ঞান ও ভক্তিবাদের অপুর্ব সামঞ্জস্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত মুক্তিত্রিবেনী সঙ্গম রচনা করিয়াছেন, যে পূন্যতর কল্যানতর ত্রিবেনীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা, এবং গঙ্গার জ্ঞানধারা সমান উত্তাল, সমস্রোতে বহমান'। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে- 'গীতা শব্দটি তিন চারিবার, বার বার বলিতে বলিতে বর্ন বিপর্যয়ে উহার বিপরীত তাগী বা ত্যাগী উচ্চারিত হয়। উহাই গীতার সারমর্ম'। সুন্দর সরল ভাষায় এমন সারগর্ভ উপদেশ মর্মস্পর্শী সত্যই। পরিশেষে এ কথাই বলা যায় গীতার বিষয়বস্তু পাঠলব্ধ নয়, সম্পূর্ণ ভাবে সাধনলব্ধ।

পাদটীকা

১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-২/৫৬,১৮/২৬
২) ঐ-৮/৭
৩) ঐ
৪) ESSAYS ON THE GITA-PAGE-INTRODUCTION-32
৫) শ্রীমদ্ভবদ্গীতা-১৮/২০
৬) ঐ-১২/৩০
৭) ঐ-১৪/২৭
৮) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৭/১৭-১৮
৯) ভাগবতপুরান-১১ /২/৪৩
১০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৭/১৪
১১) ঐ-১৮/৬৬
১২) বিষ্ণুপুরাণ-৫ /১৩
১৩) ঐ, ৫/১৩

সহায়ক গ্রন্থ তালিকা

১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদিকা), গোরক্ষপুর; গীতা প্রেস,২০১১।
২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জয়দয়াল গোয়েন্দকা, গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষপুর;গীতা প্রেস, ২০১৮।
৩) Essays on the Gita– Sri Aurobinda– Presidency Libray– 2014

* Milan Dey, State Aided College Teacher at Kharagpur College, West Bengal, India.

Book Review

A New Message and Dream for the Seekers

Rituparna Adak*

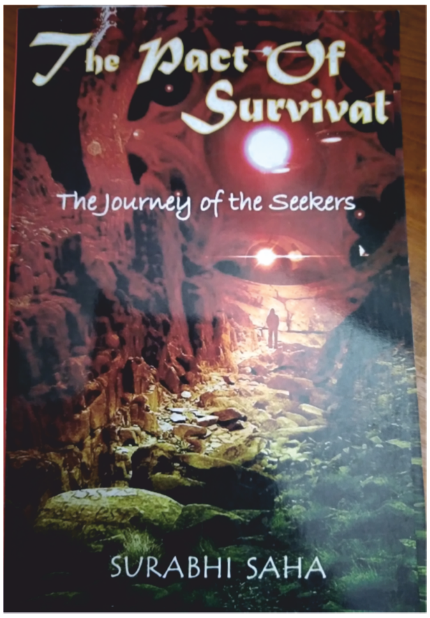

The Pact of Survival : The Journey of the Seekers
Author: Surabhi Saha, Price: 155/- Edition: 2021 Publisher: Adhikaran Prakashan, New Delhi, No. of pages 115

The novel 'The Pact of Survival : The Journey of the Seekers' incorporates the development of human culture depicted through the growth of the inner self of Shree, a college tean of weak and timid nature. It has a fanatical storyline where the protagonist embarks on a journey to find 'hope' through a series of bizarre dreams.

Framed within a circular narrative, the novel has several interconnected episodes leading to a suitable ending.

The novel or rather it can better be termed as a 'novelette' opens with a dream and the visceral opening dream foreshadows what happens next in the novel. The dreams are carefully constructed keeping in mind the story's needs and the author has succeeded in making them interesting to the readers. After one dream the readers keep waiting for the next one much like the protagonist herself. Dreams and reality are carefully mingled. The protagonist wraps her dreams around the hope for a better future and then makes those dream a reality.

Various subjects have been touched upon but the main subject that has been delineated is the question of struggle for survival on this planet where hope is constantly dwindling into oblivion and the negative forces like hate, avarice, greed, melancholy, depressions etc. are the biggest challenges to face. In a mythical grab the novelist has portrayed the journey of the seekers, shree and Yuth, in search of lost hope and their journey is full of struggle.

The message of this book is clear, without hope and empathy men can turn on one another without thought or reason. Everybody should have a fair chance of life and happiness. It reminds one of modern men's struggle for survival. The author has created a relatable protagonist in the narrator whose personal growth doesn't erase her faults. At the end, the protagonist undergoes transformation and becomes strong enough to find hope.

This novel will definitely hold the interest of the readers. The narration moves smoothly and although it is not an extremely difficult read, it is thought provoking and very engrossing. It can be recommended to anyone as it has the required suspense to hold the reader and enjoy thoroughly.

*Rituparna Adak, Presently Teaching English languate and literature at Colonelgola Sri Narayan Vidya Bhawan Girls High School, Midnapore West Bengal, India.

INQUEST-KSERA/2384-6813/12